
জানবার
কথা
নয়



জানবার কথা

নবম খণ্ড

জানবার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

স্বাক্ষর
লি মি টে ড

॥ প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর,১৯৫৪ ॥

প্রকাশক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি, চৌরঙ্গী টেরাস, কলকাতা ২০ ॥ মুদ্রাকর : নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না প্রেস লিমিটেড, ৩৭২, রসা রোড সাউথ, কলকাতা ৩৩ ॥ বাঁধিয়েছেন : ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ ১০০, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ ॥ গণশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ॥ ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি, ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা ৯ ॥

যাঁরা ব্লক তৈরি করেছেন : অমৃতলাল দাস, প্রফুল্ল বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস। যাঁরা শিসের হরফ সাজিয়েছেন : সুকুমার দত্ত, প্রশান্ত নিয়োগী, বিশ্বনাথ মৈত্র, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, ভোলানাথ চক্রবর্তী, সুধীর সাহা। যাঁরা ছাপার যন্ত্র চালিয়েছেন : নারায়ণ দাস, গৌরহরি স্বর্ণকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুদেব দে। যাঁরা বই বাঁধিয়েছেন : আব্দুল হামিদ মিয়া, অনিলচন্দ্র বসাক, গৌরীশঙ্কর দত্ত।

॥ দাম : প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা ॥

পরিবেশক : বেঙ্গল পাব্লিসার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জানবার কথা

॥ লিখেছেন ॥

অশোক ঘোষ
চিন্মোহন সেহানবীশ
জগদীশ দাশগুপ্ত
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রভাত দাশগুপ্ত
প্রশান্ত সান্যাল
মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রমাকৃষ্ণ মৈত্র
শ্যামল চক্রবর্তী
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

॥ ছবি এঁকেছেন ॥

অমূল্য দাশ
জ্যোৎস্না ঘোষ-দস্তিদার
প্রবীর দাশগুপ্ত
হরনারায়ণ দাশ

॥ প্রচ্ছদপট ॥

খালেদ চৌধুরী

॥ উৎসর্গ ॥

যারা দুনিয়াকে জেনে দুনিয়াকে বদলাবে
যারা আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে
নতুন ভবিষ্যৎ যারা মুঠোয় আনবে
আমাদের দেশের সেই ছোটো ছোটো
ছেলেমেয়েদের
উদ্দেশে

।। কৃতজ্ঞতা ।।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিল্পের ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রকাশিত এই বইটি প্রস্তুত করবার কাজে বিশেষ করে নিম্নোক্ত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমরা এগুলির লেখক ও প্রকাশক-দের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা—চতুর্দশ সংস্করণ।

বিশ্বকোষ—দ্বিতীয় সংস্করণের কয়েক খণ্ড।

লাইভ্‌স্ অব্ ফ্রেঞ্চ পেন্টার্স—পকেট বুক

দি পকেট বুক অব্ গ্রেট ড্রয়িং,

দি মীনিং অব্ আর্ট—হার্বার্ট রীড্

স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং—মেহতা

ইত্যাদি ইত্যাদি।

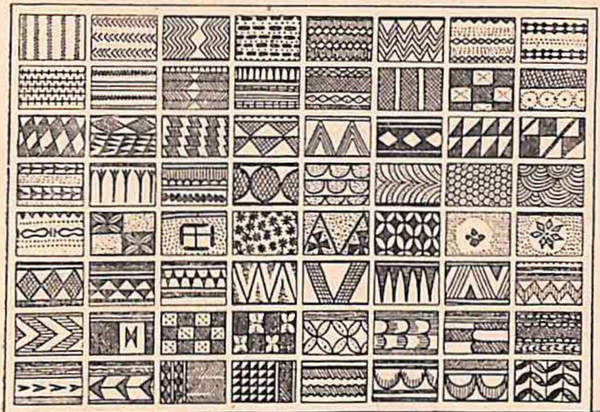
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ডক্টর স্টেলা ক্রেম্‌রিশের 'হিন্দু টেম্‌প্‌লস্' এবং শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায়ের 'ফোক্‌ আর্ট অব্ বেঙ্গল' থেকে ছবি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।

আমাদের সবচেয়ে বড়ো ঋণ হলো শ্রীঅশোক মিত্র রচিত 'পশ্চিম ইয়োরোপের চিত্রকলা' নামের বইটির কাছে। বইটি এখনো যন্ত্রস্থ রয়েছে। কিন্তু সেটির পাণ্ডুলিপি অবস্থা থেকেই আমরা বিশেষ সাহায্য লাভ করেছি।

১৯৫১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট শ্রীঅশোক মিত্রের অসামান্য কীর্তি। কিন্তু শুধু এই রিপোর্টের রচয়িতা বলে যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁরা আসলে তাঁর প্রতিভার মাত্র একটি দিকের সঙ্গেই পরিচিত। তাঁর ঘনিষ্ঠতর বন্ধুরা তাঁকে সাহিত্যের ও শিল্পের বিশেষ অনুরাগী ও বিজ্ঞ সমঝদার বলে শ্রদ্ধা করেন। সম্প্রতি তাঁর কয়েকজন বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে তিনি বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের জন্যে শিল্প বিষয়ে দুটি সহজ-সরল বই লিখতে স্বীকৃত হন। একটি বই হলো, পশ্চিম ইয়োরোপের চিত্রকলা; আর একটি বই ভারতবর্ষের চিত্রকলা। এ-জাতীয় বই লিখে তিনি বাংলা শিশু-সাহিত্যের মস্ত বড়ো অভাব পূর্ণ করলেন।

বিশেষ করে তাঁর ওই বই দুটির কথা তুলছি এই কারণে যে, আমাদের জানবার কথার সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে শিল্পের ইতিহাস নিয়ে সামান্য আলোচনাই করা সম্ভব হবে। এর পর সহজ সরল ভাষায় এর চেয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার দরকার আছে। সুখের বিষয়, এতোদিনে বাংলায় সেরকম বই সত্যিই তৈরি হলো।

প্রকাশক : জানবার কথা



সুন্দরের স্রষ্টা মানুষ

আমাদের এই 'জানবার কথা'য় যা-কিছু আলোচনা তার সবটুকুই হলো মানুষকে ঘিরে, মানুষকে কেন্দ্র করে।

শুরু করেছিলাম, মানুষ সম্বন্ধে এক ধরনের কথা নিয়ে :

মানুষ এলো কোথা থেকে ? মানুষ কী করে বড়ো হলো ? কতো দিক থেকে কতো ভাবে জয় করতে শিখলো পৃথিবীকে ? মানুষ কোথা থেকে শুরু করে আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে ! আরো কতোদূর এগিয়ে যাবে আগামীকাল !

কিন্তু শুধু প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েই মানুষের সমস্যা নয়। আরো একটা সমস্যা হলো নিজেদের নিয়ে—অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে।

পৃথিবীর বুকে নানান দেশ। নানান দেশে নানান ধরনের মানুষ! আজকের দিনে তারা নানান ভাবে এই সমস্যার সমাধান খুঁজছে। তার মধ্যে কোনোটা বা ঠিক, কোনোটা বা ভুল। কোনটে ঠিক? কোনটে ভুল? কী করে তা বোঝা যাবে?

এই পর্যন্ত বলতে বলতেই শেষ হলো আমাদের সাত নম্বরের বই।

তারপর আমাদের আলোচনার মোড় ঘুরলো। শুরু হলো মানুষের নতুন পরিচয়।

কী পরিচয়?

স্রষ্টা মানুষ।

জানোয়ারের দল অর্থহীন চিৎকার করে। মানুষ তাতে রাজি হয় নি। মানুষ কথা বলে। ভাষা ফুটলো মানুষের মুখে। কী করে ফুটলো? কিসের তাগিদে?

আর, শুধুই কী তাই? শুধুই কি মনের কথাটুকু মুখ-ফুটে বলতে পারা নাকি? নিশ্চয়ই নয়। মানুষ তার মনের কথাটি হাজার বছর পরের মানুষদের জন্যে জমিয়ে রাখতে শিখলো—কতো হাজার বছর তা কে জানে!

মানুষ আবিষ্কার করলো লেখার হরফ।

কিন্তু মানুষ তো আর শুধুই লেখার হরফ আবিষ্কার করে নি। রীতিমতো লেখকও হয়ে উঠেছে। লেখার হরফ জানলেই লেখক হওয়া যায় না। লেখক বলি তাকেই যে-কিনা রীতিমতো সাহিত্য রচনা করতে পারে।

তাই সাহিত্যের কথাও। সাহিত্য কী? সাহিত্য কেন?

স্রষ্টা মানুষ।

মানুষের এই নতুন পরিচয়টির সূত্র ধরেই আমরা 'জানবার কথা'-র আট নম্বর বই পেরিয়ে ন নম্বর বইতে এসে গেলাম। এখানেও স্রষ্টা মানুষের কথা,—আর-একটা দিক থেকে।

অর্থহীন চিৎকারকে ঘষে মেজে মানুষ সৃষ্টি করেছে ভাষা। অর্থহীন—স্থূল—পাথরের চাঁই থেকে আর রূপহীন কাদার তাল্ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছে কতো অপরূপ রূপ।

দেয়ালের গায়ে, কাপড়ের ওপরে, কাগজের ওপরে—কতোই না আশ্চর্য ছবি!

কিন্তু কেন? থেকে থেকে মানুষ ছবি আঁকতে শুরু করলো কেন?

সে-এক কোন আদ্যিকালের কথা। শুরু করা যাক সেইখান থেকেই।

॥ ষাঁড়! ষাঁড়! কী অদ্ভুত! ॥

এত্তোটুকু ছোট্ট একটি মেয়ে। তার বয়েস তখন মাত্র পাঁচ বছর। অথচ মেয়েটির কথা দারুণ বিখ্যাত হয়ে গেলো।

সে এক বড়ো মজার গল্প।

১৮৭৯ সালের কথা। স্পেন দেশে আল্টামিরা বলে এক গুহার খবর পাওয়া গেলো। সে-গুহায় নাকি কোন এক আদ্যিকালে আদিম মানুষেরা বাস করতো।

জমিদার-মশাই ভাবলেন, গুহাটাকে ভালো করে তল্লাস করলে সেই আদিম মানুষদের হাড়গোড় আর পাথরের হাতিয়ার পাওয়া যেতে পারে।

জমিদার-মশাই তাই চললেন, গুহাটাকে তল্লাস করতে। সঙ্গে চললো কে? তাঁর পাঁচবছর বয়েসের পুঁটকে মেয়ে। সে অবশ্য অতোশতো বোঝে না। সে বেরুলো বাবার হাত ধরে একটুখানি বেড়িয়ে আসতে।

গুহায় ঢুকে তো জমিদার-মশাই মেঝের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাড়গোড় আর হাতিয়ার খুজতে লেগে গেলেন। কিন্তু ওইটুকু মেয়ের এ-সব ব্যাপার ভালো লাগবে কেন? সে করলো কি, একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে গুহার মধ্যে একটু-আধটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখ পড়লো গুহাটার এক জায়গার কড়িকাঠের দিকে। আর মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, ষাঁড়! ষাঁড়!

ছুটে এলেন জমিদার-মশাই। গুহার মধ্যে সত্যিই ষাঁড় বেরিয়েছে নাকি?

না। ঠিক ষাঁড় নয়। তবু ঠিক ষাঁড়ের মতোই।

ষাঁড়ের ছবি!

কিন্তু এই আদ্যিকালের গুহার মধ্যে অমন জায়গায় ষাঁড়ের ছবি আঁকলো কে?

গুহার মধ্যে জমিদার-মশাই যাদের হাড়গোড় খুঁজতে এসেছিলেন তারাই নাকি?

ছোট্ট মেয়েটির এই আবিষ্কারের খবরটা রটে যাবার পর বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা ওই আল্টামিরা গুহায় গিয়ে হাজির। তাঁদের মধ্যে তর্কাতর্কি লেগে গেলো। কেউ কেউ ঘাড় নাড়িয়ে বললেন, এ-সব ছবি আদিম মানুষদের আঁকা হতেই পারে না। আদিকালের অসভ্য আর আধবুনো মানুষগুলোর মধ্যে এমন আশ্চর্য ছবি-আঁকিয়ে লোক থাকবে কেমন করে? তাই এ-নিশ্চয়ই অনেক পরের যুগের ব্যাপার—কে জানে, হয়তো কোনো এক একালেরই আধপাগলা আর্টিস্ট ওই নির্জন গুহায় ঢুকে মনের খেয়াল মিটিয়েছে! আর্টিস্টদের যে কতোসব বেয়াড়া রকমের খেয়াল থাকে তাকি আর আমরা জানি না নাকি?

প্রায় বছর ষোলো ধরে পণ্ডিত-মহলে ওই ষাঁড়ের ছবি নিয়ে বেজায় তর্ক-বিতর্ক চললো। তাঁদের মধ্যে একদল হলেন একেবারে নাস্তিক। অর্থাৎ কিনা, আদিম মানুষেরা যে একান্তই ছবি আঁকতে জানতো এই কথাটি তাঁরা কিছুতেই মানতে রাজি নন।

এমন সময়, ১৮৯৫-এ, স্পেন দেশেই আবিষ্কার হলো আর-একটা গুহা। আর সেই গুহাটা দেখে নাস্তিকদের মুখ একেবারে চুপ!

চুপ কেন?

কেননা, গুহাটা যে সত্যিসত্যিই আদিম মানুষদের ডেরা ছিলো এ-বিষয়ে দেদার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। গুহাটা দিয়ে এগিয়ে গেলে অনেক ভেতর দিকে একটা সুড়ঙ্গ পাওয়া যায়। কিন্তু গুহাটা যখন আবিষ্কার হলো তখন সোজাসুজি ওই সুড়ঙ্গ পর্যন্ত যাবার জো নেই। কেননা, অনেক যুগ ধরে ধুলোমাটি জমতে জমতে ওই সুড়ঙ্গর মুখটা বুঁজে গিয়েছিলো। কোদাল-গাঁইতি দিয়ে সেই ধুলোমাটি সরাবার পরই পাওয়া গেলো সুড়ঙ্গের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছবার পথ। আর তাই, এমনতরো কথা কিছুতেই বলা গেলো না যে এ-যুগেরই কোনো আধপাগলা আর্টিস্ট কিছুকাল আগে ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকেছিলো মনের খেয়াল মিটিয়ে ছবি আঁকবার জন্যে। কেননা, ওই ধুলোমাটি সরাবার আগে কারুর পক্ষে সুড়ঙ্গটা পর্যন্ত যাওয়াই সম্ভব ছিলো না।

আর সুড়ঙ্গটায় পৌঁছে কী দেখা গেলো? দেখা গেলো তার দেয়ালে আর আশপাশের খুপরিগুলোতে ছবি আঁকা রয়েছে! শুধু ছবি নয়! রীতিমতো রকমারি কারুকার্যও!

কারা আঁকলো এ-সব ছবি? কারা করলো ওই কারুকার্য? নিশ্চয়ই সেই প্রাচীন যুগের মানুষেরা। সেই আদিম মানুষেরা।

তারপর অবশ্য আরো অনেক জায়গার গুহাতে আদিম

মানুষদের আঁকা ছবি পাওয়া গিয়েছে। ফরাসীদেশে, স্পেনে, উত্তর আফ্রিকায়, আরো নানা জায়গায়। আর পণ্ডিতেরা হিসেবপত্তর করে বলছেন, কোনো কোনো ছবির বয়েস এমন কি খ্রীষ্টপূর্ব ১০,০০০ থেকে ৩০,০০০ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব।

॥ কেন ছবি আঁকতো ॥

কিন্তু কথা হলো, ওরা ছবি আঁকতো কেন? কিসের জন্যে? কী ভেবে?

আজকালকার মতো ঘর-সাজাবার জন্যে নাকি? ছবি দেখে যাতে চোখজোড়া একটু জুড়োয়, মনটা একটু খুশি হয়,—তাই জন্যে নাকি?

তা নয়। তা হতেই পারে না। ওদের বলে এমনই দীনদরিদ্র অবস্থা যে গুহা সাজিয়ে মন খুশি করবার আশায় চিত্রবিচিত্র করার কথাই ওঠে না। তাছাড়া, এ-সব ছবি অনেক সময় এমন কিম্ভুতকিমাকার জায়গায় আঁকা যে সেখান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোনোই এক দায়। হয়তো বা হামাগুড়ি দিয়ে বা বুকে হেঁটে গুহার শেষ পর্যন্ত এগুলে তবেই এ-সব ছবি চোখে পড়বে। ছবি দেখে পাঁচজনের মন খুশি হবে—এই উদ্দেশ্যেই যদি ছবি আঁকা হয় তাহলে নিশ্চয়ই বেছে বেছে ওই রকমের বেয়াড়া ধরনের জায়গায় ছবি আঁকবার কথাই ওঠে না।

তাহলে? ওরা কেন ছবি আঁকতো? কোন উদ্দেশ্যে?

অবশ্যই সরাসরি ওদের মুখ থেকে এ-প্রশ্নের উত্তর পাবার

উপায় নেই। তবু বৈজ্ঞানিকেরা ছাড়বার পাত্র নন। অনেক ভেবে-চিন্তে, অনেক রকম প্রমাণের ওপর নির্ভর করে, তাঁরা এই প্রশ্নের জবাব বের করেছেন।

জবাবটা ঠাহর করতে হলে শুরুতে একটি কথা মনে রাখা দরকার। আজকালকার দিনে আমাদের মনে যে-রকম ভাবনা-চিন্তা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, তার সঙ্গে আদিম-মানুষদের ভাবনা-চিন্তায় অনেক সময় আকাশ-পাতাল তফাত। ওরা মনে করতো, ছবি এঁকে যদি মনের কামনা সফল হবার নকল করা যায় তাহলে সত্যিসত্যিই কামনাটা সফল হয়ে যাবে। কী রকম? একটা নমুনা দেখা যাক। হরিণ শিকার করতে হবে। তাহলে কামনাটা হলো যেন হরিণ শিকার করা যায়। তাই, ছবিতে হরিণ এঁকে আর ছবি এঁকে সেই হরিণের গায়ে যদি একটা বান বিঁধিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কামনা সফল হবার একটা নকল তোলা যাবে। ওরা ভাবতো, এইভাবে সত্যিসত্যিই হিরণ-শিকারের কাজটি সফল হবার সম্ভাবনা।

এ-রকম মনের বিশ্বাসকে বলা হয় জাদু-বিশ্বাস। জাদু-বিশ্বাসের কথা 'জানবার কথা'র দশ নম্বর বইতে বড়ো করে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বিশ্বাসটিই ছিলো আদিম মানুষদের আঁকা ছবির মূল কথা। এ-বিশ্বাস না থাকলে তখনকার অবস্থায় মানুষদের পক্ষে বাঁচা দুষ্কর হতো। তাই ছবি আঁকাটা তাদের কাছে মনের শখ-মেটানো ধরনের ব্যাপার ছিলো না। তার বদলে ছিলো, প্রাণ বাঁচাবারই এক রকমের চেষ্টা।

॥ ছবি আঁকবার সরঞ্জাম ॥

তখনকার কালে নিশ্চয়ই আজকালকার মতো ছবি আঁকবার জন্যে কাগজ বা কাপড় পাওয়া যেতো না। ওরা ছবি আঁকতো পাথরের ওপর, গুহার ভেতরকার দেয়ালের গায়ে।

কী দিয়ে ছবি আঁকতো? রঙ পেতো কেমন করে?

মাটির রঙ সবসময়েই মেটে নয়। কথায় বলি, বর্ধমানের রাঙা মাটি। জায়গায় জায়গায় রীতিমতো রঙ-বেরঙের মাটি পাওয়া যায়। রঙ-বেরঙের হয় কেন? তার কারণ, মাটির সঙ্গে অনেক জায়গায় অনেক রকম খনিজ মেশানো থাকে। আর হাওয়ার মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন। রকমারি খনিজ এই অক্সিজেনের স্পর্শে এসে রকমারি রঙের হয়ে যায়; খনিজ-মেশানো মাটি রঙিন হয়ে ওঠে। এইভাবেই লোহামেশানো মাটি হয়ে ওঠে রাঙামাটি, ম্যাঙ্গানিজ থেকে পাওয়া যায় নীলচে-কালো রঙ। অক্সিজেনের স্পর্শ পেয়ে কোনো মাটি হয়ে যায় গাঢ় হলুদ, কোনো মাটি গাঢ় কমলালেবু রঙের। আদিম মানুষেরা এই সব রঙ-বেরঙের মাটি জোগাড় করতো। আর পোড়া হাড় থেকে ওরা পেতো কালো। অবশ্যই, এ কালোর মুশকিল হচ্ছে, রঙটা তেমন পাকা হয় না। রোদে-জলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তবে, আদিম মানুষেরা ছবি আঁকতো এমন সব জায়গায় যেখানে রোদবৃষ্টির উৎপাত নেই। তাই তাদের আঁকা ছবি অতোদিন আগেকার হলেও এখনও ততো নষ্ট হয়নি।

রঙিন মাটি গুঁড়ো করে চর্বির সঙ্গে মেশালে রীতিমতো তেল-

রঙ হয়ে যায়। আর ওরা যে এইভাবেই তেল-রঙ তৈরি করে নিতো সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, খোদ আদিম মানুষদের তৈরি-করা রঙের পাত্র আবিষ্কার হয়েছে। তাছাড়াও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে পাথরের মধ্যে খোঁদল-করা প্রদীপ ধরনের জিনিস। যে-সব জায়গায় ওরা ছবি আঁকতো তা অনেক সময় একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো না হলে মানুষ ছবি আঁকবে কেমন করে? পিদিমের তেল বলতে সেকালে ছিলো চর্বি।

আর তুলি? তুলি হিসেবে ওরা যে ঠিক কী ব্যবহার করতো সে-সম্বন্ধে আজকালকার পণ্ডিতেরা সুনিশ্চিত হতে পারছেন না। হয়তো হাড়ের ছুঁচোলো অংশ থেকেই ওরা ছবি আঁকবার কলম বানিয়ে নিতো। কিন্তু যে-উপায়েই আঁকা হোক না কেন, ওদের আঁকা ছবি অনেক সময় আশ্চর্য সুন্দর!

।। আদিম ছবির কথা ।।

আদিম মানুষদের আঁকা ছবির বৈশিষ্ট্য কী রকম? এ-বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। প্রথমে ধরা যাক একটা ফটোগ্রাফের কথা। নজর করলেই বোঝা যাবে তাতে দূরের জিনিস ছোটো দেখায়, কাছের জিনিস বড়ো দেখায়। তাহলে ছবি আঁকবার সময়ও কাছের জিনিস আর দূরের জিনিসের মধ্যে তফাত করতে হলে একটাকে বড়ো আর একটাকে ছোটো করে আঁকা উচিত। কিন্তু আদিম মানুষদের আঁকা ছবিতে এ-সব তফাত করবার তাগিদ দেখা যায় না। তেমনিই আবার, যে-

কোনো জিনিসকে সামনের দিক থেকে দেখতে এক-রকম, পাশের দিক থেকে দেখতে অন্যরকম। ফটোগ্রাফ তোলবার সময় যে-দিক থেকে ফটোগ্রাফ তুলবো জিনিসটার ছবি হবে সেই দিক থেকে দেখতে পাবার সামিল। তেমনি, ছবি আঁকবার সময়েও শিল্পী খেয়াল রাখতে পারেন, যে-জিনিসটার ছবি আঁকা হচ্ছে সেটাকে ঠিক কোন দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আদিম মানুষদের আঁকা ছবিতে এ-রকম কোনো খেয়াল রাখবার পরিচয় নেই। ওরা হয়তো এমনভাবে একটা হরিণ আঁকলো যে তার পাগুলো দেখলে মনে হয় হরিণটাকে পাশের দিক থেকে দেখা হচ্ছে, কিন্তু চোখগুলো দেখলে মনে হয় যেন হরিণটাকে সামনের দিক থেকে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া, আদিম ছবিতে ছবির বিষয়বস্তুটিকে সুডোল করে তোলবার চেষ্টা নেই—ছবির হরিণটা যেন কাগজ কেটে তৈরি করা হরিণের মতো, তার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, কিন্তু আয়তন নেই। এই বইতে আদিম মানুষের আঁকা ছবির যে-সব নমুনা পাবে তার সঙ্গে একটা পাথরের মূর্তির, কিংবা, পরের যুগের একটা ইউরোপীয় ছবির তুলনা করে দেখো—এদিক থেকে দুয়ের মধ্যে তফাতটা দেখতে পাবে। তেমনিই আবার ওদের ছবিতে জিনিসটার সমস্ত খুঁটিনাটি লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তোলবার তাগিদ দেখা যায় না। ছবির হরিণকে কোনো একটা বিশেষ হরিণের মতো হুবহু হতে হবে—তার কোনো দরকার নেই। তাই, তার পাগুলোকে যে হুবহু হরিণের পায়ের মতো করেই আঁকতে হবে তাও নয়। ওরা হয়তো পা আঁকবার চেষ্টাই

করলো না, কিংবা হয়তো, পায়ের জায়গায় সোজা-সোজা কয়েকটি দাঁড়ি টেনে দিলো। কিংবা একটা ষাঁড় আঁকবার সময় ষাঁড়টার গায়ের লোমগুলোকেও যে খুঁটিয়ে আঁকবার চেষ্টা করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। তার বদলে, যে-জিনিসটা ওরা আঁকছে সেটার একেবারে মূল লক্ষণগুলো ফুটিয়ে তোলাই হলো ওদের উদ্দেশ্য। ফলে, ওদের আঁকা একটা হরিণকে ঠিক এই হরিণ বা ওই হরিণ বা কোনো একটা বিশেষ হরিণ মনে হয় না। তার বদলে ওরা যেটুকু আঁকলো তা যে-কোনো হরিণ হতে পারে। কেননা, ওরা যা এঁকেছে তা সব হরিণের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। তাই, হরিণ হিসাবে চিনতে এতোটুকুও অসুবিধা হয় না; হরিণের মূল খবরটুকু ফুটিয়ে তোলাই হলো ওদের ছবির উদ্দেশ্য। কিংবা ধরা যাক, ওরা একটা মানুষ আঁকলো। মানুষটা ঠিক অমুখের মতো দেখতেও হলো না, তমুখের মতো দেখতেও হলো না। ছবির মানুষটার মধ্যে মানুষের সব রকম খুঁটিনাটি বর্ণনাও পাওয়া গেলো না—কাছ থেকে দেখা, না দূর থেকে দেখা, পাশ থেকে দেখা না সামনে থেকে দেখা, এ-সব ব্যাপার নিয়েও কোনো মাথাব্যথা নেই। তাই মানুষটা যে-কোনো মানুষের ছবি হতে পারে, খানিকটা বা সামনে থেকে দেখা আর খানিকটা বা পাশ থেকে দেখাও হতে পারে। কেবল মানুষের মূল লক্ষণগুলির উপরে ঝোঁক। ছবিটা তাই শুধু মানুষের ছবি, অর্থাৎ কিনা সব মানুষেরই ছবি,—মানুষমাত্রেরই ছবি। তাছাড়া, আরো কথা আছে। হরিণটা ঠিক কেমন দেখতে সে-খবর দেওয়ার জন্যে তো আর ওরা ছবি আঁকছে না। ওদের ছবি আঁকার মূলে হরিণটা

সম্বন্ধে একটা বিশেষ কোনো খবর দেবার তাগিদ রয়েছে। আর সেই খবরটি দেবার জন্যে আসল হরিণের আসল চেহারায় যে-সামঞ্জস্যটা আছে তা মানবার চেষ্টা না করেই ওরা দরকার-মতো জানোয়ারটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বাড়িয়ে কমিয়ে আঁকবার ব্যবস্থা করতো। হয়তো, হরিণটা তীরবেগে দৌড়চ্ছে, এই খবরটুকুই। আর এই খবরটুকু ফুটিয়ে তোলার জন্যে ওরা হরিণের চেহারাটাকে খুশিমতো বাঁকাচোরা করে নিতে দ্বিধা করবে না। হয়তো হরিণটাকে টেনে লম্বা করে আঁকবে। আমরা দেখেই বুঝতে পারবো, আসল পৃথিবীতে ও-রকমের লম্বা হরিণ হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমরা এইটুকুও সঙ্গে সঙ্গে বলবো যে ছবিটা দেখেই মনে হচ্ছে হরিণটা দৌড়চ্ছে দারুণ জোরে! কিংবা হয়তো একদল মানুষের নাচের একটা ছবি আঁকা হলো। ওদের আঁকায় প্রধান ঝোঁক—নাচের দোলাটা ফুটিয়ে তোলা। এই মূল বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে ওরা দরকারমতো নাচিয়েদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাড়িয়ে-কমিয়ে, এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে, ছবি আঁকতো। কেননা, আসল কথা হলো নাচ, পুরো দলের নাচ। বাস্তব মানুষদের অবিকল চেহারা আঁকাই যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে অন্য কথা ছিলো। কিন্তু ওদের কাছে ছবির উদ্দেশ্য তা নয়।

।। অনাড়ম্বর, সহজ আর জীবন্ত ।।

সভ্য হবার পর মানুষের জীবনে অনেক তফাত হয়েছে। মানুষের যেমন ঐশ্বর্য বেড়েছে তেমনিই আবার জীবন অনেক

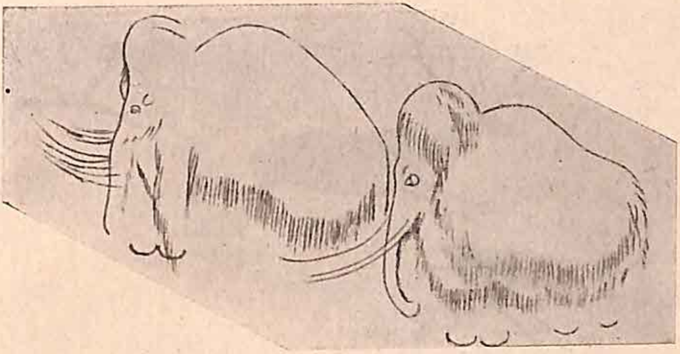
জটিল হয়েছে, নানানভাবে কৃত্রিম হয়েছে। আড়ম্বর বেড়েছে, নানান দিক থেকে হারিয়ে গিয়েছে অতীতের সরলতা। শিশুরা যে-রকম সরল হাসি হাসতে পারে বড়োরা সে-রকম পারে না। তেমনি মানুষও যখন ছেলেমানুষ ছিলো তখন তার জীবন ছিলো অনাড়ম্বর, সহজ আর সরল। আদিম যুগের ছবিতে সেই সারল্যটার পরিচয় পাওয়া যায়। আর তাই, শিশুর মুখের হাসি দেখতে যে-রকম সুন্দর লাগে সেই রকমই সৌন্দর্যের স্বাদ পাওয়া যায় আদিম যুগের ছবিগুলির মধ্যে। প্রাণের স্পন্দনে অপরূপ এই ছবি।

স্রষ্টা মানুষের এই যে আদিম পরিচয়, এর মধ্যেই হয়তো শিল্প-সৃষ্টির একেবারে মূল রহস্যটির খবর পাওয়া যেতে পারে। আজকালকার বড়ো বড়ো শিল্পরসিকেরা তাই একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন এই আদিম ছবির কথা বলতে গিয়ে।

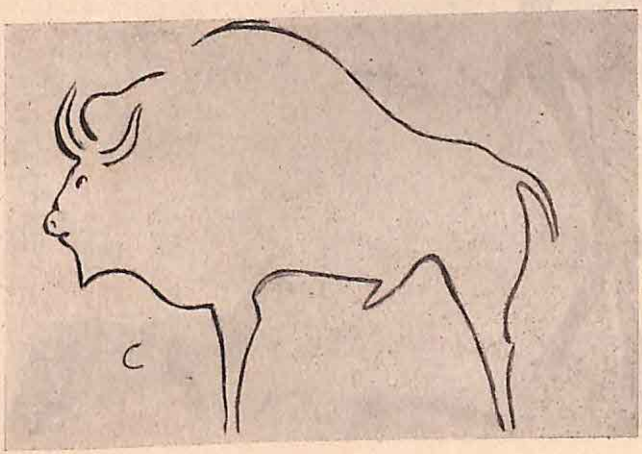
এই সঙ্গে কিন্তু আরো কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার।

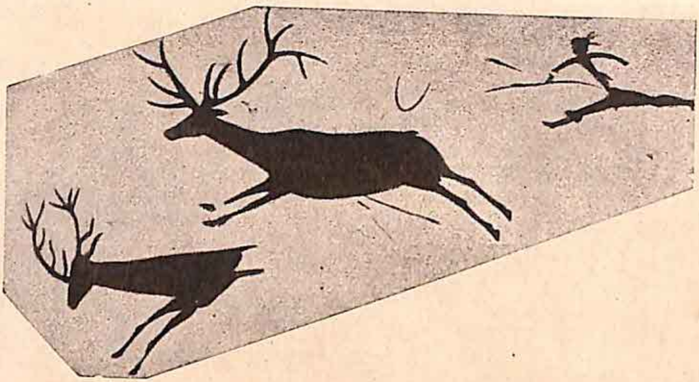
শিশুর সারল্য দেখে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু তার মানে কি এই যে আমরা আবার ওই শিশুর অবস্থায় ফিরে যেতে চাইবো? নিশ্চয়ই নয়। অনেক দিনের অনেক চেষ্টার ফলে, —অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, জ্ঞান সঞ্চয় করে,—ছোটো থেকে মানুষ বড়ো হয়েছে। তাই ছোটো হবার দিকে আবার ফিরে যাবার চেষ্টার কোনো মানে হয় না। কিন্তু তাই বলে বড়ো বয়েসের জটিলতা আর কৃত্রিমতা ছেড়ে, ছোটোদের ওই সহজ সারল্যটা পেতে পারাও কম কথা নয়।

মানুষের ইতিহাসের বেলাতেও এই কথা।



পুরনো পাথর যুগের গুহাচিত্র
দুটিই ফরাসীদেশের গুহা থেকে পাওয়া





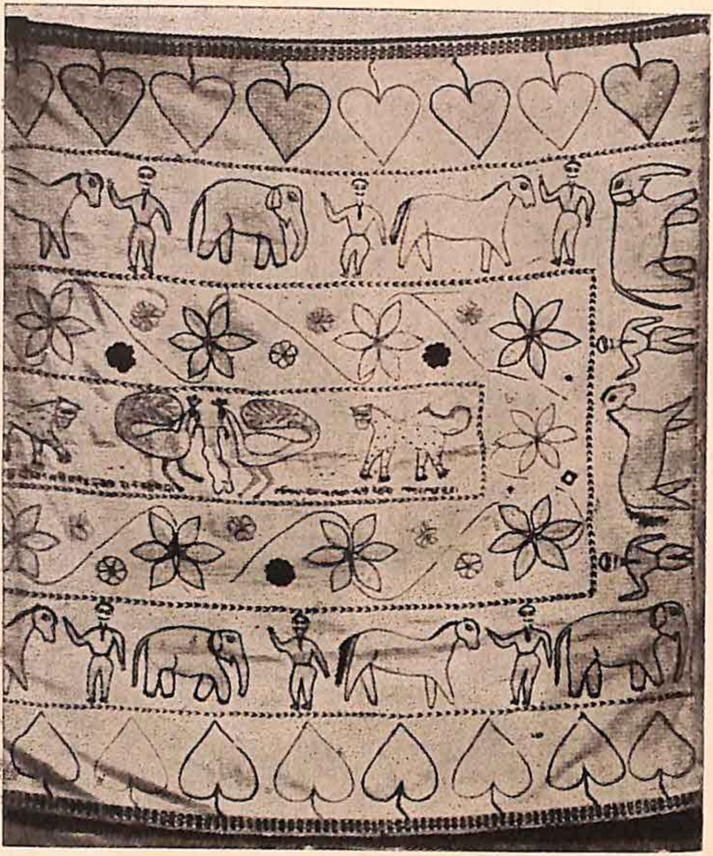
পুরনো পাথর যুগের গুহাচিত্র : স্পেন





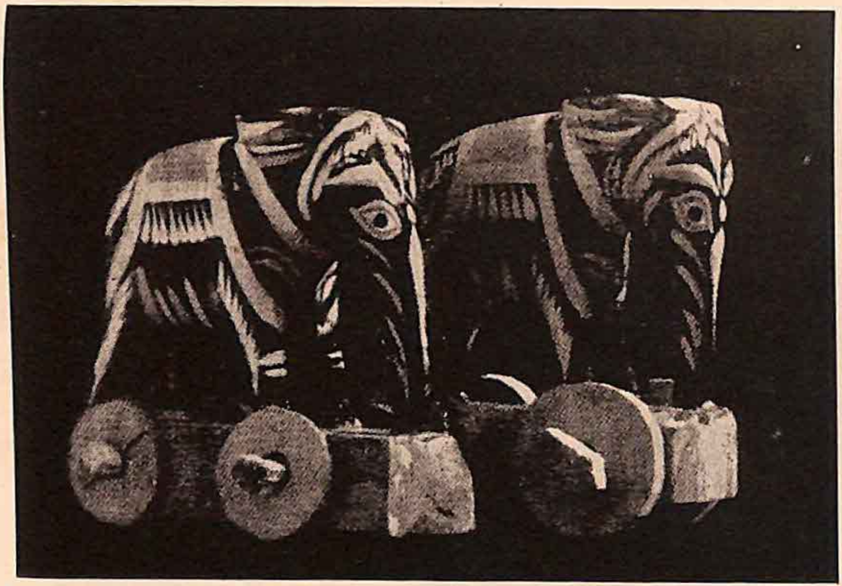
লোকশিল্প : বাংলার পট

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়ের 'ফোক আর্ট অব বেঙ্গল' থেকে গৃহীত]



লোকশিল্প : বাংলার কাঁথা

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়ের 'ফোক আর্ট অব বেঙ্গল' থেকে গৃহীত]



লোকশিল্প : বাংলার পুতুল
[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়ের 'ফোক আর্ট অব বেঙ্গল' থেকে গৃহীত]



মিশরের রানী : ভাস্কর-মূর্তি



ক্রীট সভ্যতার চিত্রকলা



প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ভাস্কর্য

আদিম মানুষের জীবনে যে সহজ অনাড়ম্বর ভাব ছিলো সেটা কম কথা নয়। আমরা আজ তার তুলনায় কৃত্রিম হয়েছি, —সরল জীবনের অনেকখানিই হয়তো হারিয়ে গিয়েছে। সেটা ফিরে পাবার চেষ্টা করবো। কিন্তু তাই বলে আদিম মানুষের দৈন্যটা নয়।

আজকের দিনে কোনো কোনো শিল্পী ভাবছেন, ছবির বেলাতেও ওই একই কথা। ওদের ছবিতে যে সহজ আর অকৃত্রিম জীবন্ত ভাবটি ফুটে উঠেছে তাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করতে হবে। ওদের ছবিগুলির সঙ্গে মনের আবেগের যে নিটোল-নিবিড় সম্পর্ক ছিলো, ওদের ছবির সঙ্গে ওদের জীবনের যে গভীর যোগাযোগটি ছিলো, তা আজকের দিনে অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এতোদিন ধরে মানুষ শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে অপরূপ জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, আবিষ্কার করেছে নতুন নতুন কৌশল, অভিজ্ঞতা পেয়েছে অজস্র রকমের—সে-সমস্ত বর্জন করে আদিম মানুষদের দীনদরিদ্র আঁকার দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। তার মানে, ক'হাজার বছর ধরে সভ্য মানুষ শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টায় যে-জ্ঞান, যে-অভিজ্ঞতা পেয়েছে, যে-ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছে,— সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে আদিম-মানুষদের সহজ আর প্রাণবন্ত সরল ভাষাটি আয়ত্ত করতে হবে।

তাঁকেই বলি জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষ যাঁর হাসি হলো শিশুর মতো সরল। এই সারল্য তো আর অজ্ঞানের দরুন নয়। জ্ঞানের পরিণতির দরুন। আজকের দিনে কোনো কোনো শিল্পী

বলছেন, ছবি আঁকবার সময়েও সেই কথাটি মনে রাখতে হবে। আদিম মানুষদের ছবিতে এতোটুকুও বাহুল্য নেই। ছবির মধ্যে ঠিক যেটুকু কথা তারা ফুটিয়ে তুলতে চায় সেইটুকুকে ফুটিয়ে তুলেই ওরা খুশি। নাচের ছবি আঁকবার সময় নাচের দোলাটুকু ফুটিয়ে তোলবার জন্যে যে-কটি রেখার টান নইলে নয়, ওরা শুধু সেইকটি রেখাই ব্যবহার করবে: নাচিয়ে মানুষদের চেহারাগুলো মানুষ হিসেবে কতোখানি নিখুঁত হলো-না-হলো, কিংবা আশপাশের অন্যান্য খবর ফুটিয়ে তোলা গেলো-কি-না-গেলো—এবিষয়ে ওরা একেবারেই উদাসীন। ওদের ছবিতে তাই এতোটুকুও বাহুল্য নেই। ফালতু নেই। ছবির উদ্দেশ্যটুকুই হলো সবচেয়ে বড়ো কথা, ছবির মধ্যে যে-আবেগটুকু ওরা ফুটিয়ে তুলতে চায় শুধুমাত্র সেই আবেগটুকুর ওপরেই ওদের সবখানি ঝোঁক।

কিন্তু ফালতু বলে যে কিছুই নেই—এর আসল কারণটা কী? আসল কারণ হলো, এর বেশি ওরা জানতোই না। এর বেশি ওরা পারতোই না। ওদের দৈন্য,—সেই দৈন্যটা অনুকরণ করবার মতো নয়। কিন্তু সরল, জীবন্ত ভাবটি দেখে অনেক কিছু শেখবার আছে।

আদিম মানুষ শুধু যে আদিম যুগেই ছিলো তা নয়। আজকের যুগেও পৃথিবীর আনাচে কানাচে অনেক জায়গায় মানুষের দল আদিম পর্যায়ে পড়ে রয়েছে। তারাও ছবি আঁকে। তাদের ছবিতেও ওই আদিম সারল্য। আজকালকার অনেক শিল্পীর চোখ পড়ছে এদের ছবির দিকেও।

॥ লোক-শিল্প ॥

আর-এক রকম ছবির দিকেও চোখ পড়ছে। তাকে বলি লোক-শিল্প বা folk-art। গাঁয়ের ছবি। সভ্যযুগের আওতাতেও যারা সহজ সরল মানুষ হিসেবে পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ, সভ্যতার আড়ম্বর যাদের স্পর্শ করে নি। আর তাই, মাটির সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, যাদের জীবনের সম্পর্ক অনেক নিবিড়।

সভ্য যুগের আভিজাতিক ছবির কথায় পরে ফিরবো। তার আগে এই লোকশিল্পের কথা কিছুটা সেরে নেওয়া যাক।

আগেই বলেছি, আদিম যুগের ছবির মূল কথা হলো জাদু-বিশ্বাস। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আজো যে-সব মানুষেরা অসভ্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাদের ছবির বেলাতেও একই কথা। কথাটা জরুরি। কেননা, জাদুবিশ্বাস আর ধর্মবিশ্বাস এক নয়। জাদুবিশ্বাসটা যতোই আজগুবি হোক না কেন, এককালে তা ছিলো বাঁচবার সহায়। তাই যে-ছবির প্রাণবস্তু হলো জাদুবিশ্বাস তার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

ধর্মবিশ্বাস ছবির প্রাণবস্তু হয়ে উঠেছে অনেক পরের যুগে।

যাকে বলি কিনা লোকশিল্প—অর্থাৎ, ওই গাঁয়ের অশিক্ষিত কিষাণদের শিল্প,—তার উদ্দেশ্যটা কী? এ-শিল্প দেখলে বোঝা যায়, হয়তো আশপাশের ধর্মবিশ্বাসের ছোঁয়াচ তার মধ্যে লেগেছে, হয়তো নানা রকম পৌরাণিক কাহিনী নিজেদের জন্যে জায়গা করে নিয়েছে এই শিল্পের মধ্যে—তবুও মোটের

উপর ধর্মবিশ্বাসকেই লোকশিল্পের প্রাণবস্তু বলা যায় না। পৌরাণিক কাহিনীও যেন রক্তমাংসের মানুষের কাহিনীই হয়ে উঠেছে, আবহাওয়াটা আভিজাতিক স্বর্গলোকের নয়—তার বদলে এই মাটির পৃথিবীর ঘরোয়া আবহাওয়াই। এই লোকশিল্প থেকে জাদুবিশ্বাসের চিহ্ন যে একেবারে মুছে গিয়েছে তাও নয়। 'জানবার কথা'র আট নম্বর বইতে জাদু-পটুয়ার কথা বলা হয়েছে। তার গল্পটা মনে আছে আশাকরি। গাঁয়ের মানুষদের শিল্পের সঙ্গে জাদুবিশ্বাসের সম্পর্কটা কী রকম তা ওই গল্প থেকেই কিছুটা আঁচ করতে পারবে। তাছাড়া, দশ নম্বর বইতে বাংলার ব্রতর কথা তোলা হয়েছে। ব্রতর আলপনাও তো লোকশিল্পই। আর এই আলপনার পিছনে যে জাদুবিশ্বাসের জোর কতোখানি সে-কথাও দশ নম্বর বইতে দেখতে পাবে।

তাহলে লোকশিল্পের মধ্যে জাদুবিশ্বাসের রেশ থেকে গিয়েছে। ধর্মবিশ্বাসের ছোঁয়াচ দেখা দিতে শুরু করেছে—তবু কিন্তু লোকশিল্পের বেলায় যেটা আরো বড়ো কথা সেটা হলো দৈনন্দিন ঘরোয়া-জীবনের জিনিসপত্রগুলিকে সুন্দর সুশ্রী করে তোলবার চেষ্টা। পরের যুগের মানুষদের কাছে কাজের সঙ্গে সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্পর্কটা বড়োই ঢিলেঢালা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গাঁয়ের মানুষদের বেলায় তা নয়। গাঁয়ের জীবনে কাজের সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক যে কতো নিবিড়—তার আলোচনা আট নম্বরের বইতে সাহিত্য আর ভাষার দিক থেকে করা হয়েছে।

গায়ের কাঁথাটায় ছুঁচের নক্সা তোলা হলো। বাসনকোসনকে করা হলো চিত্রবিচিত্র। ঘরের দাওয়ায় আঁকা হলো আলপনা।

কচি ছেলেপুলেদের জন্যে গড়া হলো রঙ-বেরঙের পুতুল—সর্বত্রই সাধারণ ঘরোয়া জিনিসগুলিকেই সুন্দর, সুশ্রী করে তোলবারচেষ্টা। আটপৌরে কাজের জীবনটা আর একঘেয়ে হয়ে থাকবে না।

আজকালকার দিনে আমরা বলি, এটা হলো চারুশিল্প আর ওটা হলো ব্যবহারিক শিল্প। অর্থাৎ কিনা কাজের সঙ্গে—ব্যবহারের সঙ্গে, বা দৈনন্দিন জীবনধারণের সঙ্গে,—আসল শিল্পের যেন সম্পর্ক নেই : সৌন্দর্য-উপভোগের কথা এক আর কাজের কথা আর-এক। তাই যেখানে কাজের ছোঁয়াচ সেখানে আসল শিল্পের জাত যাবার জোগাড়। কিন্তু লোকশিল্পের বেলায় মোটেই তা নয়। তাই লোকশিল্পের এই মূল লক্ষণটির কথা মনে রাখা অতো জরুরি। দ্বিতীয়ত, লোকশিল্পের আর-একটি মূল কথা হলো, কতকগুলি বাঁধাধরা রীতিনীতি। গাছ আঁকবার সময় কোনো একটা বিশেষ গাছকে নকল করবার দরকার নেই। লোকশিল্পে একটা বাঁধাধরা গাছের গড়ম আছে। সেটা এ-গাছ, ও-গাছ, সব-গাছেরই ছবি হবে। তাই সব-ছবির বেলাতেই গাছগুলো মোটের উপর একই রকম দেখতে হতে পারে। তেমনি পাখিরও একটা বাঁধাধরা গড়ন আছে, মাছেরও একটা বাঁধাধরা গড়ন আছে, মানুষেরও বাঁধাধরা গড়ন আছে। এই যে মানুষটি, তাকে দেখতে তোমার মতোও নয়, আমার মতোও নয়—লোক-শিল্পের সব মানুষই ওই রকম। তাছাড়া, লোক-শিল্পের বেলাতেও দেখা যায় ছবিকে সুডোল করবার কোনো চেষ্টা নেই।

তাই, এদিক থেকে লোকশিল্পের গড়নগুলিকে আমরা হয়তো ছাঁচে-ঢালা একই রকমের বলতে পারতাম। কিন্তু অমন বাঁধা-

ধরা হলেও এই মূল গড়নগুলিতে এমন সুন্দর ছন্দময় ভঙ্গি ফুটে ওঠে যে ছাঁচে-ঢালা বলে শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক নয়। কেননা ছাঁচে-ঢালা শুনলে বড়ো একঘেয়ে মনে হয়। লোকশিল্প আর যাই হোক, একঘেয়ে নয়। বরং, দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি থেকেই মানুষকে মুক্তি দেবার আয়োজন।

লোকশিল্পের এই রীতিনীতিগুলি এমন বাঁধাধরা হয়ে থেকেছে তার একটা বড়ো কারণ হলো, গাঁয়ের ওই শিল্পীরা সাধারণত পুরুষানুক্রমে শিল্পী। আমাদের দেশে এদেরই বলা হয় পটুয়া। যারা পট করে। বাপের কাছে বসে ছেলে কাজ শিখেছে, ঠাকুর্দার কাছে বসে বাপ কাজ শিখেছিলো—এইভাবেই মূল গড়নগুলি বংশানুক্রমিকভাবে চলে এসেছে তাদের মধ্যে। আর এই গাঁয়ের শিল্পীরা হলো একেবারে ষোলো আনা গাঁয়ের মানুষ; বাইরের পৃথিবীর কোনো প্রভাব বা সমাজের অন্য স্তরের জীবনের কোনো প্রভাব এই শিল্পের ওপর এসে পড়েনি। কিংবা যদিই তা এসে পড়ে তাহলে গাঁয়ের লোকের আঁকা হলেও এ-শিল্প খাঁটি লোকশিল্প হবে না। আজকালকার পাদ্রিদের কৃপায় যেমন হাফ্-প্যান্ট-পরা সাঁওতালেরা। প্রকৃত সহজ-সরল সাঁওতালদের সঙ্গে এদের অনেক তফাত।

কিন্তু এইখানে একটি বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়ে। আলাদা আলাদা দেশের বেলায় লোকশিল্প খুব কিছু আলাদা আলাদা ধরনের নয়। একেবারে মূল লক্ষণের দিক থেকে দেখলে বোঝা যায়, বিভিন্ন দেশের লোকশিল্পের মধ্যে মিল রয়েছে। অথচ, এই মিলটুকু দেখে মনে করা উচিত নয় যে লোকশিল্পের

লক্ষণগুলির দিক থেকে এদেশ ওদেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলেছে। কেননা, আগেই বলেছি, লোকশিল্পীদের উপর বাইরের পৃথিবীর প্রভাব এসে পড়ে না।

আর শুধু লোকশিল্পের বেলাতেই এই কথা নয়। আদিম মানুষদের আঁকা ছবি আর অসভ্য মানুষদের আঁকা ছবির বেলাতেও একই কথা।

এ-রকমের মিল থাকবার আসল কারণটা কি এই যে, সব দেশের মানুষের বেলাতেই মূল আবেগ-অনুভূতিগুলি মোটের উপর একই রকমের? এ-ধরনের ছবিতে ওই আবেগ-অনুভূতিগুলিকে অসামান্য সরল ছবির ভাষায় ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা বলেই কি এই মিল?

।। সভ্য ছবির আদি-পর্ব: মিশর ।।

বড়ো বড়ো নদীর কিনারা জুড়ে গড়ে উঠলো মানুষের প্রথম সভ্যতা। ছবির ইতিহাসে কী রকম তফাত হলো? মোহেঞ্জো-দারোর কথা পরে বলবো। মিশরের কথাই প্রথমে দেখা যাক।

মানুষ যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে তা তো আদিম অসভ্য অবস্থা থেকে এগুতে এগুতেই। তাই মিশরদেশেও সভ্যতা গড়ে ওঠবার আগেকার একটা সুদীর্ঘ অধ্যায় ছিলো। আদিম মানুষদের সৃষ্টিকরা শিল্প মিশরেও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। আমাদের আলোচনা হলো, নতুন পর্যায়ে পৌঁছবার পর শিল্পের দিক থেকে কী রকম তফাত হলো?

তফাতটাকে বুঝতে হবে দুদিক থেকে। প্রথমত, নতুন কী পাওয়া গেলো? দ্বিতীয়ত, পুরানো কী হারাতে হলো? পাওয়া গেলো ঐশ্বর্য; শিল্প হয়ে উঠলো জমকালো, আভিজাতিক,—চেয়ে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হারাতে হলো সহজ সরল জীবনের স্পন্দনটি,—শিল্প হয়ে উঠলো কৃত্রিম। জীবনের আলো-বাতাস থেকে সরে গিয়ে শিল্প আশ্রয় নিতে লাগলো কবরের অন্ধকারে। দুটো কথাই সত্যি। দুটো কথাই ভালো করে মনে রাখতে হবে।

শিল্পে নতুন ঐশ্বর্য—তা যে কতো দিক থেকে, কতো রকমের, তার হিসেব দেওয়া সহজ কথা নয়। মিশরের শিল্পে সোনা-রুপো আর হীরে-জহরতের যেন ছড়াছড়ি—পাথরের কাজ, হাতির দাঁতের কাজ, ধাতুর কাজ—দেখতে দেখতে চোখ জ্বালা করে। কিন্তু তার সবটাই যেন মৃত্যুর হিম-হাওয়ায় জমাট বেঁধে গিয়েছে। প্রাণের সাড়া নেই। গতি নেই। জমকালো, আড়ম্বরপূর্ণ—কিন্তু মনের আবেগের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এ-শিল্প মনকে নাড়ায় না, প্রাণকে দোলায় না, মাতিয়ে তোলে না মানুষকে। ছবির মানুষগুলোও জ্যামিতির আঁক-জোঁকের মতো মাপাজোপা বাঁধা-ধরা। আর জ্যামিতির আঁকজোঁকের মতোই তারা নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ, নিশ্চল।

কৃত্রিমতা যে কতো দিক থেকে তার কিছু কিছু নমুনা দেখা যাবে। কিন্তু তার আগে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। এক হলো, ধর্মবিশ্বাসের আবির্ভাব। আর-এক হলো, রাজশক্তির আবির্ভাব। অবশ্য, প্রাচীন-মিশরের বেলায় এই দুয়ের মধ্যে

সম্পর্কটা খুব স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। সে-কথা 'জানবার কথা'র অন্যান্য বইতে আলোচনা করা হয়েছে।

আদিম মানুষেরা থাকতো দল বেঁধে, দশে মিলে এক হয়ে। দলের মানুষদের সামনে কামনা সফল হবার ছবিটা এঁকে দিয়ে মাতিয়ে তোলা হতো পুরো দলকে। লোকশিল্পের বেলাতেও শিল্পের সম্পর্ক থেকেছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কর্মজীবনের সঙ্গে। কিন্তু মিশরের জমকালো শিল্পের বেলায় এ-সম্পর্কটি কেটে গেলো। ফলে, জাঁকজমক যতোই বাড়ুক না কেন, শিল্প হয়ে গেলো নির্জীব।

মিশর-সভ্যতার শিল্পের নিদর্শনগুলিকে আজ উদ্ধার করে আনতে হচ্ছে প্রধানতই কবরখানা খুড়ে—শিল্পের উদ্দেশ্য যে কতোখানি কৃত্রিম আর প্রাণহীন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তার প্রমাণ এর চেয়ে সাংঘাতিক আর কী হতে পারে? মরা রাজার মন জোগাবে বলে যে-শিল্প তার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ আসা কঠিন নয় কি? অথচ, নিপুণতার দিক থেকে শিল্পীরা কতোদূর এগিয়ে গেলো! ঐশ্বর্যের দিক থেকে মিশরের শিল্প কী অপরূপই না হয়ে উঠলো!

কী সূক্ষ্ম কাজ! ছেনি, বাটালি কতো ধারালো হয়ে উঠেছে! তুলি ফুটিয়ে তুলতে শিখেছে কী নিপুণ রেখা। রঙের বাহার আর ধাতুর আর পাথরের ব্যবহার দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। তবু সব কিছু রুদ্ধ, নিষ্ফল—জ্যামিতির আঁকজোঁকের মতো।

রাজশক্তির প্রচণ্ড প্রতাপ যে কীভাবে শিল্পীর কৌশলকে কৃত্রিম করে তুলেছিলো তার ছোটো একটা নমুনা দেখা যাক।

একই ছবিতে অনেক মানুষকে আঁকবার সময় কাছের মানুষ আর দূরের মানুষের মধ্যে তফাত দেখাবার স্বাভাবিক উপায় হলো— কাছের লোককে বড়ো করে আঁকা, দূরের লোককে ছোটো করে আঁকা। কিন্তু মিশরে যারা ছবি আঁকতো তাদের পক্ষে এইভাবে আঁকবার স্বাধীনতা ছিলো না। কেননা, তাদের কাছে সবচেয়ে জোরালো চাহিদা হলো রাজাকে প্রকাণ্ড বড়ো করে আঁকবার—রাজাকে সাধারণ মানুষদের চেয়ে ঢের ঢের বড়ো করে দেখাতে হবে। তাহলে কাছের মানুষের সঙ্গে দূরের মানুষের তফাতটা ফোটানো হবে কেমন করে? ওরা এক অদ্ভুত কৃত্রিম উপায়ে তা করবার চেষ্টা করতো। একসার মানুষ এঁকে তার ওপরে আর একসার মানুষ এঁকে দিতো। দু সারের মানুষই অবিকল সমান দেখতে। কিন্তু দেখবার সময় কল্পনা করে নিতে হবে যে একসার সামনে আর একসার পিছনে। আরো কথা আছে। আসল উদ্দেশ্য তো রাজাকে বড়ো করে দেখানো। তাই, ছবির মূল কথাটা যদি এই হয় যে অসংখ্য মানুষ মিলে রাজার প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্তি টেনে নিয়ে চলেছে তাহলে ওই অসংখ্য মানুষগুলিকে আঁকবার সময় সাঁটে আঁকলেই চলবে। তাই মানুষের একটি সাংকেতিক চিহ্নের মতো একই রকমের চেহারা পরপর সাজিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট হবে। ('জানবার কথা' ২য় বই ৫১ পৃষ্ঠা দেখো)

হয়তো, এ-সব দিক থেকে আদিম ছবির সঙ্গে মিশরের ছবির কলাকৌশলে মিল আছে। কিন্তু যেটা বড়ো তফাত সেটার দিকেই আপাতত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। মিশরের ছবির

বেলায় এই লক্ষণগুলি কৃত্রিমতার পরিচায়ক। রাজশক্তির আর ধর্মবিশ্বাসের কঠিন শাসনে শিল্পী এ-জাতীয় কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হতেন। আদিম যুগের শিল্পীরা এর চেয়ে বেশি কলাকৌশল জানতো না। কিন্তু যেটুকু জানতো তার সবটুকুই উজোড় করে দিত প্রাণের স্পর্শ ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। আর মিশরের শিল্পীদের মাথা নোয়ানো ছিলো রাজাদের সামনে। তাই এর চেয়ে বেশি এগুবার মতো স্বাধীনতা তাদের ছিলো না।

ভারতীয় শিল্প

ভারতবর্ষের অনেক গুহায়,—বিশেষত উত্তর ও মধ্য ভারতে— আদিম মানুষদের আঁকা ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির বেশির ভাগই নব্য-প্রস্তর যুগের ছবি; যদিও কেউ কেউ মনে করেন এর মধ্যে কোনো কোনোটা এমনকি প্রাচীন প্রস্তর-যুগেরও হতে পারে। মিরজাপুর জেলা এবং বিন্ধ্য পাহাড়ের গুহার ছবিতে গণ্ডার-শিকারের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। হোসেঙ্গাবাদ জেলায় নাকি জিরাফ-এর ছবি পাওয়া গিয়েছে, সিঙ্গনপুর অঞ্চলের ছবিতে ক্যাঙারুর মতো দেখতে জানোয়ারের

খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ-সব জানোয়ার তো আর আজকাল আমাদের দেশে নেই। কিন্তু ছবি থেকেই প্রমাণ যে এককালে ছিলো। যে কালের ছবি সে-কালে ছিলো। আর তাহলে এই থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে কতো পুরোনো কালের আঁকা এই ছবিগুলি। তাছাড়া পাওয়া যাচ্ছে ঘোড়া আর হরিণের এমন সব ছবি যার সঙ্গে নাকি স্পেনের প্রাচীন প্রস্তর যুগের ছবিগুলির আশ্চর্য মিল আছে। ভারতবর্ষের এই আদিম ছবির কথা আলাদা করে আলোচনা করবার বিশেষ কিছু নেই। কেননা আমরা আগেই বলেছি, সবদেশের বেলাতেই আদিম ছবির মূল কথাটি একই রকম।

তাই, একেবারে মোহেনজোদারো-হরপ্পার কথা থেকেই শুরু করা যাক।

॥ সিন্ধু-সভ্যতা ॥

প্রথমেই কিন্তু বলে রাখা দরকার, এই শহরটিতে সৌন্দর্যের দিকে খুব যেএকটা ঝোঁক ছিলো তা বলা যায় না। আজকালকার কোনো বড়ো ফ্যাক্টরি-ওয়ালা শহরে ঢুকলে যে-রকম মনে হয়, সৌন্দর্যের চেয়ে কাজকর্মের সুবিধে-অসুবিধের দিকেই বেশি ঝোঁক—হরপ্পা আর মোহেনজোদারো শহরের বেলাতেও অনেকটা সেই রকম। ঝামা-ইটের সারি-সারি বাড়ি, চওড়া পথ, নর্দমা-নালার খাসা ব্যবস্থা। কিন্তু শিল্প-সৌন্দর্য নিয়ে উৎসাহটা তেমন বেশি চোখে পড়ে না।

এক রকম নরম পাথর আলাবাস্টার আর মার্বেল পাথরের কিছু

কিছু মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একটি মূর্তির মাথার টুপিতে বেশ সূক্ষ্ম কাজ, চুলের অনুকরণ বলে মনে হয়। পোড়া মাটির ছোটো ছোটো দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে—তাদের মাথায় চুল-ফাঁপিয়ে খোঁপা বাঁধবার ধরনটা বেশ এলাহি, তাদের গায়ের গয়না-গাঁটির সঙ্গে অনেক পরের যুগের ভারতীয় শিল্পের যে-ধরনের গয়নাগাঁটি দেখতে পাওয়া যায় তার সঙ্গে মিল আছে। পোড়া মাটির তৈরি,—কোনোকোনোটা বা চকচকে পালিস-করা ধরনের,—নানা রকম জন্তুজানোয়ারের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে—ষাঁড়, গণ্ডার, কুকুর, মুরগি। কিন্তু এই শহর থেকে পাওয়া শিল্প হিসেবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো অজস্র সিল—সেগুলির ওপর হরেক রকমের জন্তুজানোয়ারের ছবি খোদাই করা রয়েছে আর তাছাড়া রয়েছে এক অদ্ভুত ধরনের আধা-ছবি-আধা-হরফ ধরনের অক্ষর। এগুলো এখনও কেউ পড়তে পারেন নি।

অবশ্যই ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্বের কাজ এখনো খুব ভালো করে করা হয় নি। অর্থাৎ কিনা, মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের নিদর্শন আবিষ্কার করবার ব্যাপারে অনেক কাজ এখনো বাকি আছে। তাই, এখনো যেন বড়ো বড়ো ফাঁক থেকে গিয়েছে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে।

॥ মৌর্য যুগ ॥

শিল্পের ইতিহাসের দিক থেকে সিন্ধু-সভ্যতার পর যে-যুগটির নিদর্শন ভালো করে পাওয়া যাচ্ছে তা হলো মৌর্য যুগ। অবশ্যই

তক্ষশিলার কিছু কিছু নিদর্শন দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইতিমধ্যে ভাস্কর্যের দিক থেকে মৌর্য-যুগের আগেই এ-দেশের শিল্পীরা রীতিমতো দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সেই দক্ষতারই পূর্ণতর বিকাশ ঘটলো মৌর্য যুগে পৌঁছে।

মৌর্য-যুগে—বিশেষ করে অশোকের সময়ে—ভারতবর্ষে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের প্রথম উচ্চাঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। পাটলিপুত্রের প্রাসাদে এবং বিখ্যাত অশোকস্তম্ভ-গুলিতে এই শিল্পের নিদর্শন—সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অশোক-স্তম্ভটি পাওয়া গিয়েছে কাশীর কাছে সারনাথ-এ। এই অশোকস্তম্ভগুলিতে অতি-নিখুঁতভাবে জানোয়ারের মূর্তি খোদাই করা হয়েছিলো। আজকালকার কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, এমন নিখুঁতভাবে জানোয়ারের মূর্তি নকল করবার রেওয়াজ ভারতবর্ষে ছিলো না; তাই এগুলির জন্যে শিল্পী আনানো হয়েছিলো বিদেশ থেকে—হয়তো গ্রীসের দিক থেকে। গ্রীসে এ-রকম শিল্পের রেওয়াজ অনেক আগেই শুরু হয়েছে। গ্রীসের কথায় পরে আসবো। আপাতত এইটুকু বলে নেওয়া দরকার যে অন্য পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই মতটা ভুল। তার মানে, জানোয়ারের মূর্তিগুলি এ-দেশের শিল্পীদেরই কীর্তি।

এ-যুগে শিল্প বলতে প্রধানতই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। তার বিষয়বস্তু প্রধানতই বৌদ্ধ-ধর্মমূলক হয়ে উঠতে লাগলো, যদিও অবশ্য হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তি যে একেবারে বাদ পড়লো তা নয়। তবে এখানে একটা কথা মনে রাখতে

হবে। সে-যুগের শিল্পীরা তো আর নিজেদের খুশিমতো বা জনসাধারণের চাহিদামতো শিল্প সৃষ্টি করতেন না—তার বদলে শিল্পের পিছনে প্রধান কথা ছিলো রাজা-রাজড়ার ফরমাস, রাষ্ট্রের নির্দেশ। তাই রাজারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে শিল্পও বৌদ্ধ-ধর্মমূলক হবার কথা।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে মস্ত বড়ো বিশেষজ্ঞ আনন্দকুমার কুমারস্বামী কয়েকটা কথা বলছেন। কথাগুলো খুব জরুরি। প্রথমত, তিনি বলছেন, অনেক সময় বৌদ্ধ-ভারত ও হিন্দু-ভারত বলে দুয়ের মধ্যে ভয়ানক বড়ো তফাত ভাবা হয়। কিন্তু সে-তফাত অনেকাংশেই কৃত্রিম। অন্তত, শিল্পের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ-শিল্প আর হিন্দু-শিল্প বলে দুরকম একেবারে জাত-আলাদা শিল্পের কথা ভাবা ঠিক নয়। সেকালের ভারতীয় শিল্পের নানান আস্তানায় দেখা যায় বৌদ্ধ আর হিন্দু—দুরকমের বিষয়বস্তুই রয়েছে। তার মানে, এক-বিষয়বস্তু-মূলক শিল্প সৃষ্টি করবার সময় অপর-বিষয়বস্তু-মূলক শিল্পকে ধ্বংস করা হয় নি। দ্বিতীয়ত, ঐ যুগটায় বৌদ্ধ-শিল্পের এতো বেশি নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে বলেই এ-কথা মনে করবার কারণ নেই যে তখন হিন্দু-বিশ্বাস-মূলক শিল্পসৃষ্টি একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। অন্য একটা ব্যাপারও আছে। বৌদ্ধ-বিশ্বাসমূলক শিল্পগুলি পাথরের উপর খোদাই করা হয়েছিলো বলেই তা এখনো এত ভালো করে টিকে রয়েছে, ; অপর পক্ষে হিন্দু-বিশ্বাসমূলক শিল্প কাঠ, মাটি ইত্যাদি অস্থায়ী জিনিসের উপর। তাই সেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

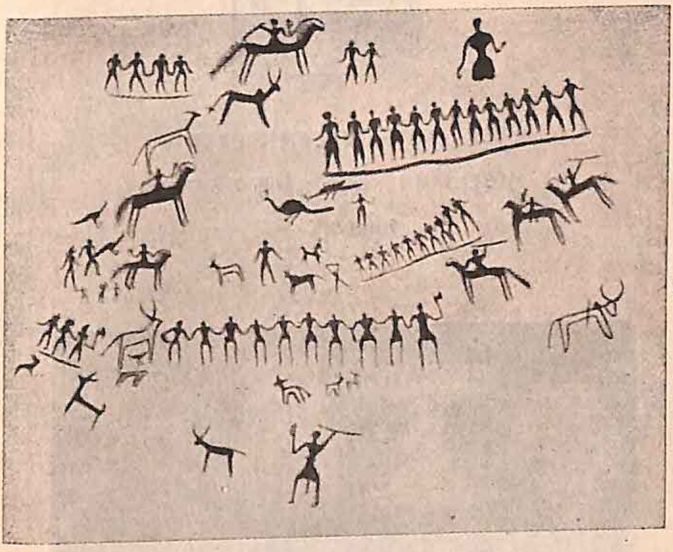
এ-যুগের শিল্পের নিদর্শন প্রধানত কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? পাটলিপুত্র আর সারনাথের কথা আগেই বলেছি। ভরহুত স্তূপও (খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫-১৫০) খুব বিখ্যাত—এর বেশির ভাগ শিল্প-নিদর্শনই কলকাতার জাদুঘরে এনে রাখা হয়েছে। বুদ্ধের জীবনীই হলো এর প্রধান বিষয়বস্তু। উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিও প্রায় একই সময়ের কীর্তি—তার বিষয়বস্তু প্রধানত জৈন-ধর্মমূলক বলে মনে হয়, যদিও অবশ্য বৌদ্ধ ও এমনকি হিন্দু-পুরাণের বিষয়বস্তুও যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না।

ভূপালের সাঁচি স্তূপ হলো বৌদ্ধ শিল্পের চরম কীর্তি। এর সবটুকুই যে একসঙ্গে তৈরী হয়েছে তা নয়। কোনো স্তূপ প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দের, কোনোটা বা তারও আগের।

দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মথুরায় একটি খুব বিখ্যাত শিল্পী-সম্প্রদায় দেখা দেয়। পরের যুগের ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব খুবই বেশি।

॥ গান্ধার-শিল্প ॥

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে—আফগানিস্তান এবং পেশোয়ার ও পাঞ্জাবের কিছু কিছু এলাকা জুড়ে (তার মধ্যে তক্ষশিলাও পড়ে) এক নতুন শিল্পী-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিলো। এই শিল্পকে বলে গান্ধার শিল্প। এবং এর কলা-কৌশলের মধ্যে গ্রীক-শিল্পের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, যদিও



হায়দ্রাবাদে পাওয়া প্রাচীন গুহাচিত্র—শিকারদৃশ্য



উপরে : মোহেন্‌জোদারো-হরপ্পায় পাওয়া সিল। নিচে : সিন্ধু-সভ্যতার সচিত্র ঘট।





সিন্ধু-সভ্যতার মাতৃমূর্তি। পোড়া-মাটির তৈরি! চার ইঞ্চি উঁচু। খৃষ্টপূর্ব ৩০০—৪০০



প্রাক্-মৌর্য যুগের মাতৃমূর্তি। পোড়া মাটির তৈরী—পৌনে আট ইঞ্চি উঁচু।



মতৃমূর্তি। মৌর্যযুগের আগেকার। সোণার তৈরি। আনুমানিক তারিখ : খৃষ্টপূর্ব ৮০০।



মাতৃমূর্তি। আনুমানিক তারিখ
খৃষ্টপূর্ব ২০০—১০০



দক্ষিণ ভারতের তামার মূর্তি—পার্বতী। সাড়ে ষোল ইঞ্চি উঁচু। তারিখঃ পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ।



দক্ষিণ ভারতের তামার মূর্তি : নটরাজ। চার ইঞ্চি উঁচু। ১৬০০-১৭০০ খৃঃ।



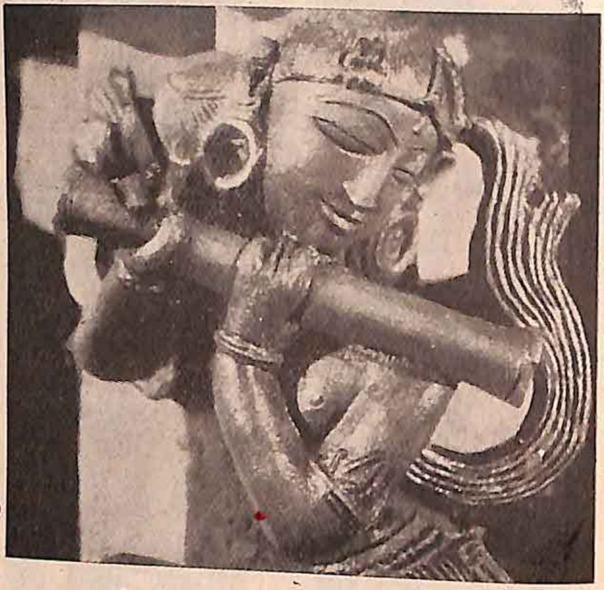
ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের তামার মূর্তি। উঁচু
২৪½ ইঞ্চি।



ষোড়শ খৃষ্টাব্দের তামার মূর্তি—বিজয়-
নগরের রাজা।



মধ্যযুগের ভাস্কর্য : মন্দিরের গায়ে পাথরের কাজ।
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে ডাঃ ষ্টেলা
ক্রামব্রিশের হিন্দু টেম্পল্‌স্ থেকে গৃহীত)।



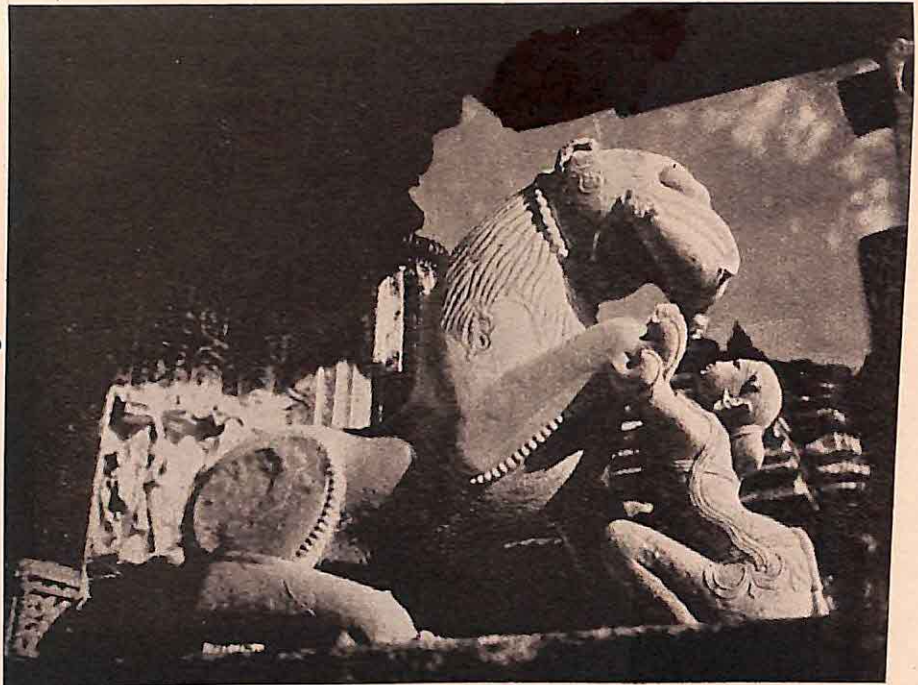
দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের গায়ে পাথরের কাজ।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে ডাঃ ষ্টেলা ক্রামব্রিশের হিন্দু টেম্পল্‌স্‌ থেকে গৃহীত)।

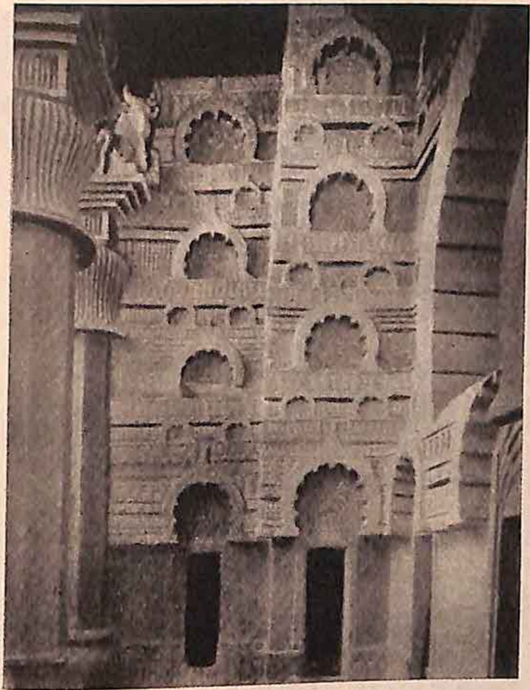


হিন্দু মন্দির : ভাস্কর্য

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে ডাঃ স্টেলা ক্রামত্রিশ-এর হিন্দু টেম্পল্‌স্‌ থেকে গৃহীত]



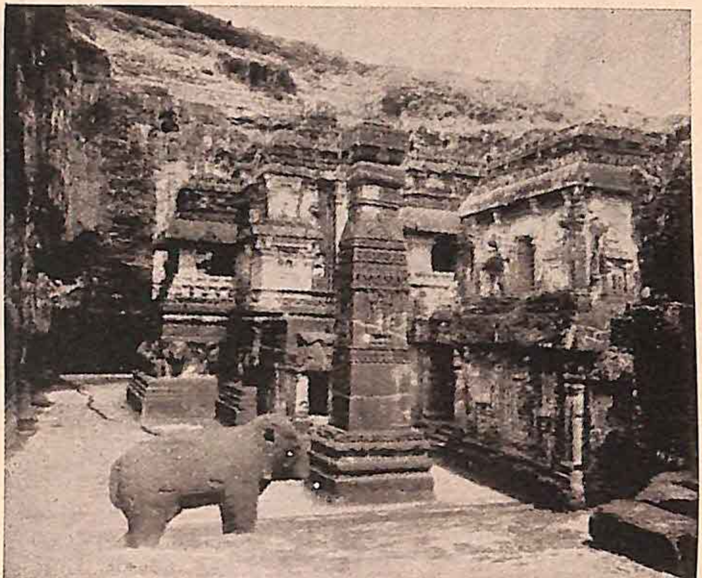
হিন্দু মন্দিরের ভাস্কর্য
[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে ডাঃ স্টেলা
ক্রামরিশ-এর হিন্দু টেম্পলস্ থেকে গৃহীত]



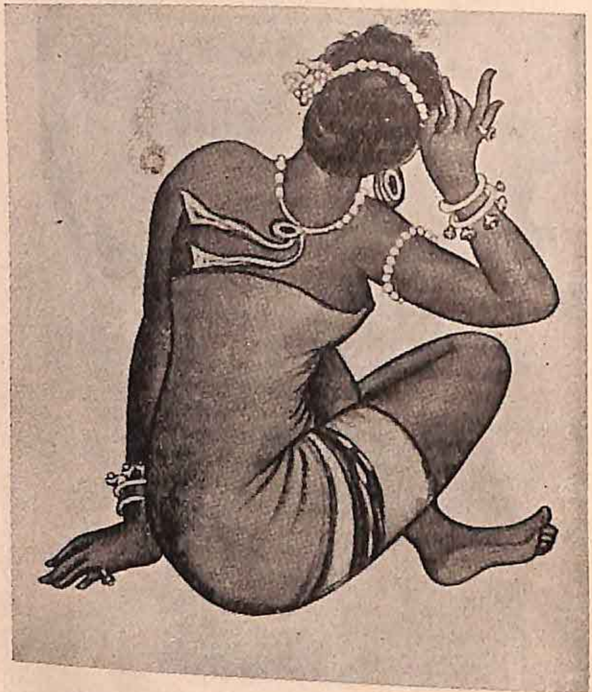
অজন্তা



অজন্তা : ভাস্কর্য



ইলোরার পাহাড়-কাটা মন্দির



অজন্তা : ফ্রেস্‌কো



বাঘ-গুহা : ফ্রেস্‌কো



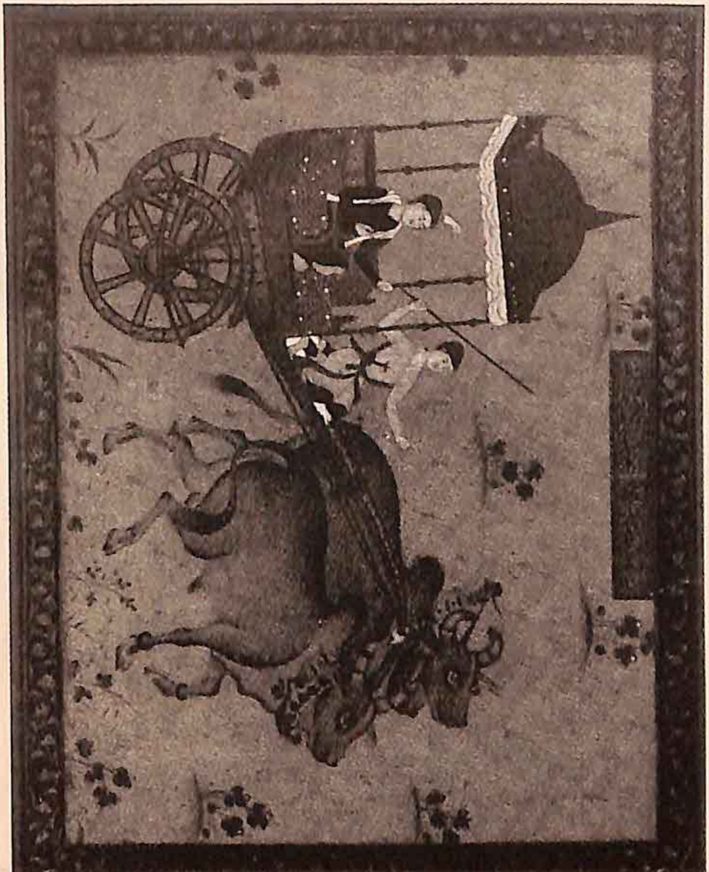
রাজপুত ছোটো ছবি : রাগমালা



রাজপুত ছোটো ছবি



রাজপুত ছোটো ছবি



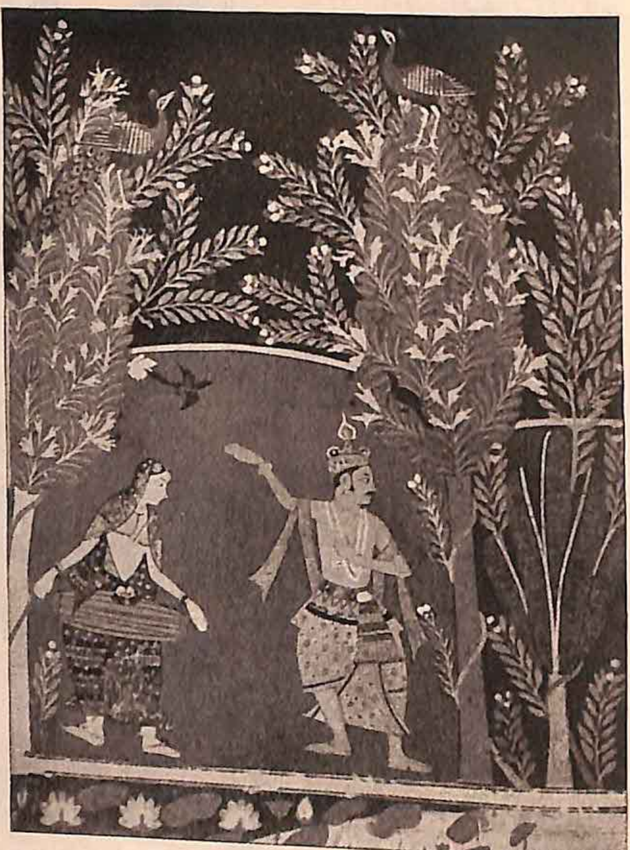
রাজপুত ছোটো ছবি



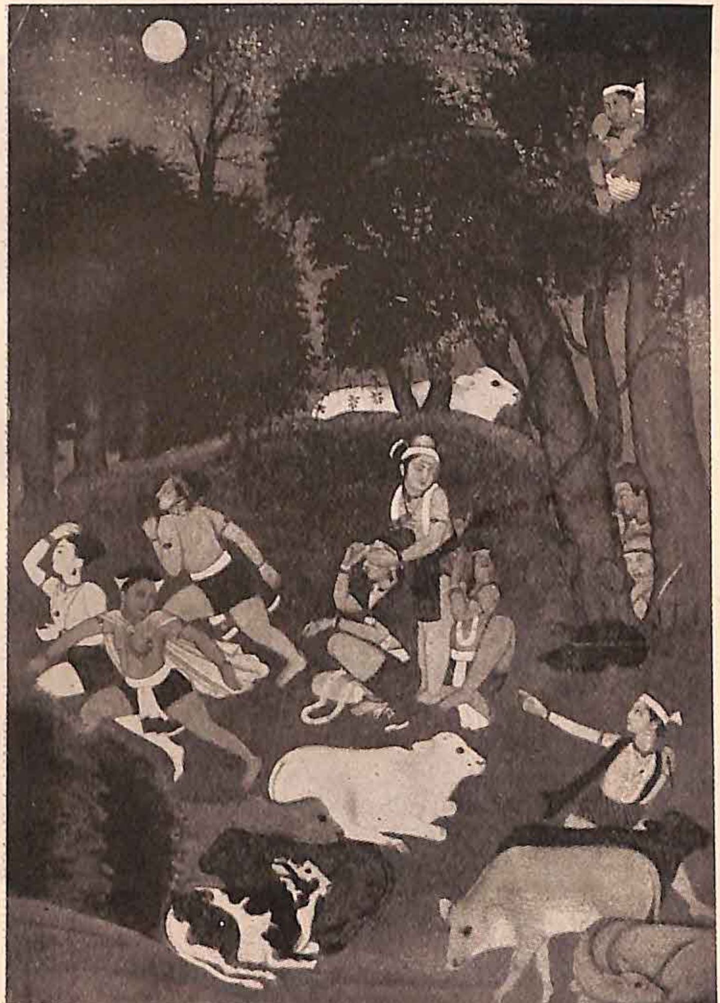
রাজপুত ছোটো ছবি



মোগল ছোটো ছবি



রাজপুত ছোটো ছবি



রাজপুত ছোটো ছবি



বাংলার লোক শিল্প

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় লিখিত ফোক আর্ট অব বেঙ্গল থেকে গৃহীত]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ-শিল্প বৌদ্ধ। তাই গান্ধার-শিল্পকে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্প বলা হয়।

এ-শিল্প ঠিক কোন সময়ের? মাত্র কয়েকটি মূর্তিতে তারিখ পাওয়া যায়, কিন্তু এই সনতারিখের হিসেবটা ঠিক কোন ধরনের তা বোঝবার উপায় নেই। কেউ কেউ সন্দেহ করছেন, বিলিতি হিসেবে ওই তারিখ প্রায় প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হবে। সনতারিখের হিসেব করবার আর-এক রকমের সূত্র পাওয়া যায় তক্ষশিলার পুরাতত্ত্বমূলক কাজ থেকে। এই সব সূত্র থেকে পণ্ডিতেরা সাব্যস্ত করছেন, গান্ধার-শিল্পের সবচেয়ে সুদিন হলো রাজা কনিষ্কের সময়। কারুর মতে কনিষ্কের সময় হলো ১২০ খ্রীষ্টাব্দ, কারুর মতে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে গান্ধার-শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের মূল ধারাটির অনেক তফাত—মূর্তিগুলির মুকুট আর আসন প্রভৃতি অন্যরকম। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, গান্ধার-শিল্পের বেলায় মূর্তিগুলিতে বাস্তব পৃথিবীর জীবজন্তু ও মানুষ হুবহু নকল করবার চেষ্টা রয়েছে, চেষ্টা রয়েছে কৃত্রিমভাবে সেগুলিকে লাবণ্যে নিটোল করে তোলবার—ঘষামাজা, ঝকঝকে, তকতকে, জমকালো, নিখুঁত। কিন্তু এই ঝোঁকটার দরুন, আনন্দকুমার কুমারস্বামী দেখাচ্ছেন, গান্ধার-শিল্প নিয়ে এককালে লেখকেরা যতোই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থাকুন না কেন, মানতেই হবে যে গান্ধার-শিল্পে ভারতীয় শিল্পের মূল ধারাটির তুলনায় কিছুটা ক্ষয়েরই চিহ্ন। ভারতীয় শিল্পের মূল ধারাটিতে আদিম শিল্পের প্রাণশক্তির পরিচয় ছিলো। কৃত্রিম লাবণ্যের খাতিরে

গান্ধার-শিল্প কিছুটা বঞ্চিত হলো সেই প্রাণশক্তি থেকে।

পঞ্চম শতাব্দীর হুন-আক্রমণেই গান্ধার-শিল্পের যুগ শেষ হয়।

॥ অজন্তা, বাঘ ও ইলোরা ॥

গান্ধার-শিল্পের পর গুপ্তযুগের কথা। গুপ্তযুগের খুবই বিখ্যাত কীর্তি হলো অজন্তা আর বাঘের 'গুহায়' দেয়ালে আঁকা ছবিগুলি, যদিও অবশ্য গুপ্ত রাজাদের উৎসাহেই যে এই ছবিগুলি আঁকা হয়েছিলো তা মনে করবার কারণ নেই। তাছাড়া এখানের সব-ছবিই যে একই যুগের তাও নয়। ন-নম্বর আর দশ-নম্বর 'গুহার' ছবিগুলি অনেক পুরোনো কালের—যীশুখ্রীষ্টের কিছুটা আগের সময়কারই হবে। ষোলো আর সতেরো নম্বর গুহার ছবিগুলিকে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের বলে মনে করা হয়। এক নম্বর আর দুনম্বর গুহার ছবি আরও পরের—খুব সম্ভব সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের।

ছবির বিষয়বস্তু প্রধানতই বৌদ্ধ জাতকের গল্প, বুদ্ধের জীবনের নানা উপাখ্যান আর তাছাড়া যক্ষ ও নাগ-সংক্রান্ত যে-সব প্রচলিত পৌরাণিক-কাহিনী বৌদ্ধধর্মের মধ্যে গৃহীত হয়েছিলো তারও কিছু কিছু। তাই বলে ছবিগুলির সবই শুধুমাত্র ধর্মমূলক নয়।

এখানে অজন্তার কথা কিছুটা বলা যাক। বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীঅরুণকুমার সেন ও শ্রীবিভূতি বসু অজন্তা সম্বন্ধে খুব ভালো আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁদেরই

আলোচনা অনুসরণ করবো। হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত ঔরঙ্গবাদ জেলায় অজুণ্টা বা আজুণ্টা বলে গ্রাম আছে। সেই গ্রামের পাশে বলেই পাহাড়ের এই গুহাগুলিকে অজন্তা-গুহা বলা হয়।

আগেই বলেছি, এখানে একটি গুহা নয়, অনেকগুলি গুহা। সবগুলি একই সময়ে ক্ষোদিত হয় নি। "খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দ পর্যন্ত নয় শত বৎসর ধরিয়া এই বিরাট স্থাপত্য ও চিত্রকলার অসাধারণ প্রয়াস চলিয়াছিল। এই গুহাগুলির নির্মাণ-কৌশল, কারুকার্য ও চিত্রকলা আজও জগতের প্রগাঢ় বিস্ময় ও প্রশংসা উৎপাদন করিতেছে।"

কিন্তু ভারতীয় শিল্পের অমন গৌরবময় কীর্তির কথা দেশের লোক একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো, গুহাগুলি লুকিয়ে ছিলো বনে-জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন শিকারী ওই বনে শিকার করতে গিয়ে এগুলির সন্ধান পান। তখনো গুহার ভেতরের ছবিগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বাদুড় আর দর্শকদের "অত্যাচারে" এগুলি অনেকখানিই একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। পরে অবশ্য যা অবশিষ্ট ছিলো তা রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে—এখন গুহাগুলি দেখতে গেলে মন খারাপ হয়ে যায়, আসল ছবির ভাঙা-চোরা আর জখম-হয়ে-যাওয়া টুকরো-টাকরা চিহ্ন ছাড়া বিশেষ কিছুই বাকি নেই

আগেই বলেছি, ছবিগুলির বিষয়বস্তু হলো প্রধানতই বৌদ্ধধর্মমূলক। কিন্তু তাই বলে এ কথা মনে করলে ভুল করা

হবে যে অলৌকিক ধর্মতত্ত্ব ছাড়া এখানে আর-কিছুর পরিচয় নেই। "কেবলমাত্র জাতকের গল্পগুলিকে চিত্রে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই যে এই মহা-শিল্পীগণ তুলিকা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না।" অজন্তায় সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনধারণের অনেক দৃশ্যই দেখতে পাওয়া যায়। "সাধারণ জীবনের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ঘটনা, এমন কি অতিসাধারণ হাসি-বিদ্রূপের দৃশ্যও বাদ যায় নাই। অজন্তার চিত্রশিল্পের যে নমুনা পাওয়া যায় তাহা লৌকিক। চিত্রকরেরা যেমন জাতকের গল্পগুলি ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তেমনি চিত্রের মধ্য দিয়া জীবনের সমস্ত অন্ত-রঙ্গ অভিব্যক্তি সজীবভাবে ব্যক্ত করিয়া চিত্রকলাবোধের এবং নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।"

বলাই বাহুল্য যে গুহার ওই ছবিগুলি যদি ন শ বছর ধরে আঁকা হয়ে থাকে তাহলে সব ছবির মূলে একই রকম কলাকৌশল হবার কথা নয়। ছবিগুলি সত্যি তা নয়ও। নানান ছবির বেলায় নানান রকম কলাকৌশল দেখতে পাওয়া যায়।

"অজন্তায় বহু বিভিন্ন চিত্রকলা-পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি পদ্ধতিতে পটের সমরূপ ছাঁদ অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে চিত্রবিষয়গুলিকে সুডৌল করিবার বা তাহার আয়তন দেখাইবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। আর একটি পদ্ধতিতে চিত্রিত বিষয়গুলি সুডৌল করিবার ও তাহাদের আয়তন জ্ঞাপনের জন্য বর্ণব্যঞ্জনায় আলোছায়াপাত এবং নানা প্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছে। এই সকল চিত্রে

আয়তন ও জনতার দৃশ্যের বিভিন্ন স্তর অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে।”

অজন্তার মতো অতো বিখ্যাত না হলেও গোয়ালিয়রের “বাঘ” গুহারও খুব নাম। এই বাঘ-গুহা আসলে বৌদ্ধ-বিহার ছিলো। এবং অজন্তার মতোই গুহার ভেতরকার দেয়ালে অপরূপ ছবি দেখতে পাওয়া যায়। আজকালকার পণ্ডিতদের ধারণায় বাঘ-গুহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিলো।

ইলোরার গুহাও হায়দ্রাবাদের আওরঙ্গাবাদ জেলায়—অজন্তা থেকে খুব বেশি দূর নয়। অজন্তার ভাস্কর্য সুনিপুণ হলেও তার আসল নাম গুহার ভিতরের ছবিগুলির জন্য; ইলোরার গুহায় ছবি থাকলেও তার আসল খ্যাতি ভাস্কর্যের জন্য।

“ইলোরার পাহাড় অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি।···ইহার দক্ষিণ ভুজে বৌদ্ধমন্দির, উত্তর ভুজে ইন্দ্রসভা বা জৈনমন্দির, মধ্যস্থলে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির।”

এগুলির মধ্যে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণদেবের আদেশে তৈরি কৈলাস মন্দিরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—পাহাড়ের গা কেটে ২৭৬ ফুট দীর্ঘ ও ১৫৪ ফুট প্রস্থ প্রাঙ্গণে এই মন্দির তৈরি হয়েছে। উপরের মণ্ডপ পূর্ব-পশ্চিমে ১৬৪ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে ১০৯ ফুট।

রাষ্ট্রকূটরাজদের সময় অষ্টম খ্রীষ্টাব্দ। ইলোরার গুহা ছাড়াও বোম্বাই-এর কাছে এলিফ্যাণ্টা গুহাও এঁদেরই কীর্তি।

মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হলো বাংলা-বিহার (পাল-রাজত্ব), উড়িষ্যা, বুন্দেলখন্দ এবং রাজপুতনা।

পালরাজত্বের তারিখ ৭৫০-১২০০, শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হলো বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। সাধারণত কালো পাথরের উপর অপরূপ নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে এই শিল্প গড়া হয়েছে, যদিও অবশ্য রংপুর ও চাটগাঁ অঞ্চল থেকে তামার মূর্তিও প্রচুর পাওয়া গিয়েছে।

এ-শিল্পের বিষয়বস্তুকে প্রধানতই বৌদ্ধ বলা যেতো ; কিন্তু ওই বৌদ্ধ-বিশ্বাসের সঙ্গে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার বহুলাংশে মিশেল হতে দেখা যায়।

মধ্যযুগের বাংলায় শিল্প বলতে শুধুমাত্র ভাস্কর্যই নয়, চিত্রকলাও। বাংলা ও নেপাল থেকে বহু তালপাতার পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি সচিত্র পাটার মলাট দিয়ে বাঁধা এবং পুথিগুলির মধ্যেও অনেক সময় ছবি আঁকা হতো।

মধ্যযুগের উড়িষ্যার শিল্প বলতে প্রধানতই ভুবনেশ্বর, কোনারক, এবং পুরীর মন্দির। এগুলি অষ্টম খ্রীষ্টাব্দ থেকে ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তৈরি হয়েছিলো বলে অনুমান করা হয়। কোনারকের মন্দির বহুলাংশেই ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু তার গায়ের কারুকার্য এমন নিপুণ যে একে ভারতীয় ভাস্কর্যের চূড়ান্ত বিকাশ বললেও বোধহয় বাড়িয়ে বলা হয় না।

॥ রাজপুত ছবি ॥

দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকবার রেওয়াজ ভারতবর্ষে অনেকদিনের পুরোনো। এবং দেশের নানা জায়গায় এ-রকম ছবির নিদর্শন পাওয়া যায়। আজো ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এ-ধরনের ছবি আঁকবার রেওয়াজ আছে। ইউরোপের বেলায় ক্যানভাস্ এবং পুথিতে ছবি আঁকবার রেওয়াজ শুরু হয়েছিলো অনেকদিন আগে; কিন্তু ভারতবর্ষে তা কখনোই খুব বহুলভাবে প্রচলিত হয়নি! দেয়ালের গায়ে ছবি ছাড়াও দেশে অবশ্য পটের ছবির অনেকদিন থেকে চল ছিলো।

কিন্তু কাগজ আবিষ্কার এবং দেশে কাগজের চল হবার পর শিল্পীরা পট এবং দেয়ালের গা ছাড়াও কাগজের উপর ছবি আঁকতে শুরু করলেন। এ-ছবি সাধারণত খুব ছোটো ছোটো মাপের। তাই এগুলিকে ছোটো-ছবি বা মিনিএচার বলা হয়।

রাজপুতনার এ-জাতীয় ছোটো-ছবিই সবচেয়ে বিখ্যাত। ছবিগুলির বিষয়বস্তু সাধারণত ধর্মমূলক। কৃষ্ণ-কাহিনীই প্রধান। যদিও অবশ্য শৈববিষয়ক ছবিও নেহাত কম নয়। তাছাড়া, রাজপুত-ছবিতে আর-একটা বিষয়বস্তুও খুব চালু ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র অনুসারে প্রতিটি রাগরাগিণীর সঙ্গে এক-এক রকম ভাবের যোগ আছে। রাজপুত ছোটো ছবির একটি প্রধান বিষয়বস্তু হলো ওই ভাবগুলি। এ-জাতীয় ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো রেখার নিপুণতা এবং রঙের ব্যবহার—রঙ এতো উজ্জ্বল যে প্রায় মিনের-কাজের মতো মনে হয়।

রাজপুত ছোটো-ছবির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো কাংড়া-উপত্যকার সম্প্রদায়টির কাজ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা সংসার চাঁদের সময়ে এই কাংড়া-সম্প্রদায়ের বিকাশ হয়েছিলো, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার পতন হয়। বর্তমানে ওই সম্প্রদায় দেশ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, রাজপুত-ছবির বেশির ভাগই আজ আর ভারতবর্ষে নেই। ইংরেজ-শাসকের এ-দেশ থেকে যে-সব সম্পদ লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে একটি প্রধান হলো ওই রাজপুত ছবি (এবং মোগল-ছবিও)। তাই ভারতবর্ষের মানুষ যদি আজ চোখ-ভরে ভারতবর্ষের ওই শিল্পসম্পদ দেখতে চায় তাহলে তাকে হয় লণ্ডনের অ্যাল্‌বার্ট-ভিক্টোরিয়া মিউজিয়ম্ যেতে হবে, আর না-হয়তো বোস্টনের জাদুঘর দেখতে যেতে হবে।

ইউরোপ

সত্যি বলতে কি, আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত আসল-ছবি চোখে দেখবার তেমন কোনো উপায় নেই। মাঝে মাঝে চিত্রপ্রদর্শনী হয়, সেখানে গেলে কিছু কিছু দেখা যায় বই কি? কিন্তু পৃথিবীর সত্যিকারের সবচেয়ে উঁচুদরের শিল্পীদের কাজ তো আর

এগুলিতে থাকে না। সান্ত্বনার মধ্যে, হালের যুগে আমাদের বাংলা দেশে কয়েকজন খুব বড়ো শিল্পী জন্মেছেন। শান্তি-নিকেতনে গেলে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসুর মূল ছবি দেখে আসা যায়, বালিগঞ্জের এককোণায় যামিনী রায়ের বাড়ি —একসঙ্গে অজস্র ভালো ছবির মাঝখানে গিয়ে পড়বার যে-অপরূপ অভিজ্ঞতা তা তাঁর বাড়ি যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা পেয়েছেন।

কিন্তু ইউরোপে সুযোগ-সুবিধে অনেক বেশি। কেননা তারা মস্ত মস্ত আর্ট-গ্যালারি বানিয়েছে; সেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পীদের মূল ছবি এনে সযত্নে রক্ষা করা হয়। যে-কোনো লোক গিয়ে তা দেখে আসতে পারে।

আমাদের দেশেও এ-ধরনের আর্ট-গ্যালারি খোলা দরকার। খোলবার জল্পনা-কল্পনা চলেছে। তা যখন খোলা হবে তখন আমরাও বিদেশে না গিয়েই সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ ছবি দেখবার সুযোগ পাবো। সে-সুযোগ এখন বড়ো কম।

আপাতত বিদেশের ছবি সম্বন্ধে দুটো চারটে কথা জানবার, আর পৃথিবীর কিছু কিছু বিখ্যাত ছবির ফটোগ্রাফ দেখে আসল ছবিগুলির কথা কল্পনা করবার চেষ্টা করা যাক।

মিশরের ছবির কথা বলা হয়েছে। সেই গল্পের জের টেনে এগুনো যাক ইউরোপীয় শিল্পের দিকে।

॥ গ্রীসের শিল্প ॥

ভারতীয় শিল্পের কথা সুদীর্ঘভাবে আলোচনা করলাম;

কিন্তু কই, তার মধ্যে তো শিল্পীদের নাম-ধাম সম্বন্ধে কিছুই বলা হলো না! কী করে বলবো? পাথরের মূর্তির গায়ে লিখে রাখা হয় নি, কে সেই মূর্তি গড়েছিলো, ছবির কোণায় লেখা নেই চিত্রকরের নাম। তাই শিল্পের কথা জানা যায়, শিল্পীর কথা জানা যায় না।

প্রাচীন গ্রীসের আঁকা-ছবির বেলায় কিন্তু ঠিক এর উলটো ব্যাপার। চিত্রকরদের নাম পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু চিত্রগুলির কোনো পাত্তা নেই। অন্তত আঁকা-ছবির মধ্যে প্রধানতম-গুলির বেলায় এই কথা—বিচিত্র মাটির ভাস্-এর গায়ে সেকালের আঁকা ছবি অবশ্য অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এ হলো অন্য রকমের ছবি। নামজাদা চিত্রকরদের আঁকা প্রধান ছবিগুলির একটিও আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কী হলো সেগুলির? হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক কাল আগেকার মিশরের ছবি তো নষ্ট হয়ে যায় নি, বা হারিয়ে যায় নি! তা যায় নি। তার কারণ দুয়ের মধ্যে তফাত ছিলো। মিশরের চিত্রকরেরা সাধারণত ছবি আঁকতেন কবরখানার মধ্যে, দেয়ালের গায়ে। তাতে শুধুই যে ছবিগুলো রোদবৃষ্টির দৌরাত্ম্য থেকে বেঁচে গিয়েছে তাই নয়, সেগুলোর কোনো রকম ঠাঁই-নাড়াও হয় নি। খানিকটা একই কারণে, অজন্তার ছবিগুলিও একাল পর্যন্ত টিকে থেকেছে। কিন্তু গ্রীসের ছবি টিকে রইলো না। কারণ, গ্রীসের চিত্রকরেরা আঁকতেন আজকালকার মতোই এমন কিছুর উপরে যা এখান থেকে ওখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আর এই ঠাঁই-নাড়ানাড়ির দরুনই

অতোকাল আগেকার ছবি হারিয়ে গিয়েছে। অপর পক্ষে, সেকালের লেখকেরা চিত্রকরদের কথা লিখে গিয়েছেন—তা থেকে তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার এই কারণেই কিন্তু ছবি ছারিয়ে গেলেও ছবিগুলি কী রকমের ছিলো তা আমাদের পক্ষে খানিকটা অনুমান করা সম্ভব। কেননা অন্যদের লেখায় এ-সব ছবির কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়।

একটা গল্প বলি। তার থেকেই আন্দাজ করা যাবে, গ্রীক চিত্রকরেরা কোন ধরনের ছবি আঁকতেন।

যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার শ' চারেক বছর আগে জিউক্সিস বলে একজন খুব নামজাদা চিত্রকর ছিলেন। তিনি একটা ছবি এঁকেছিলেন—একটি ছেলে একথোলো আঙুর নিয়ে যাচ্ছে। ছবির আঙুরগুলির সঙ্গে আসল আঙুরের নাকি এমন মিল ছিলো যে ছবি দেখে পাখিরা পর্যন্ত উড়ে আসতো ওই ছবির আঙুরকে আসল আঙুর বলে ভুল করে তার উপর ঠোঁট ঠোক-রাবার জন্যে। পারাসিয়াস বলে আর এক চিত্রকরের সঙ্গে জিউক্সিসের পাল্লা হয়। পারাসিয়াস নাকি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, কিন্তু আঙুরগুলো হুবহু হলেও ছেলেটার ছবি নিশ্চয়ই হুবহু হয় নি। তা যদি হতো, তা হলে পাখিরা ঠোক্কর দিতে আসবার সাহস পেতো না—আসল মানুষ যখন আসল আঙুরের থোলো নিয়ে হাঁটে তখন তো কই পাখিরা ঠোক্কর মারতে সাহস পায় না!

এই গল্প থেকেই খানিকটা আন্দাজ করতে পারা যায়,

ওই লুপ্ত ছবিগুলির ঝোঁকটা কোন দিকে ছিলো ; ছবি হবে আসল জিনিসের একেবারে হুবহু নকল—ছবির আঙুরকে কতোখানি আসল আঙুরের মতো দেখতে করা যায় তারই চেষ্টা। কিন্তু, কথা হলো, তাতে লাভটা কী? লোককে বোকা বানানো যায়, এই পর্যন্ত। ছবির বাঘটাকে দেখে আসল বাঘ ভেবে হয়তো আঁতকে উঠবো, আর কেউ হয়তো আমাদের দেখে হেসে উঠবে। কিন্তু তাই বলেই তো আর তাকে ভালো ছবি বলবার দরকার পড়বে না।

অবশ্য, আগেই বলেছি, মাটির তৈরি ভাস্-এর গায়ে আর-এক রকম গ্রীক ছবির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আর এই ছবিগুলি সত্যিই অপরূপ। এগুলির বেলায় ছবির জিনিস-গুলিকে বাস্তব জিনিসের একেবারে হুবহু নকল করে তোলবার দিকে ঝোঁক নেই—ঘড়ার গায়ের ওইটুকু জায়গায় তা করা যায়ও না।

ভাস্-গুলির গায়ের ছবিতে নানা রকম পৌরাণিক উপাখ্যান ও দেবদেবীর কল্পিত মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, তাছাড়াও পাওয়া যায় সাধারণ মানুষের সাধারণ সুখদুঃখময় জীবনের অনেক রকম দৃশ্য।

অবশ্যই, শিল্পের ইতিহাসে গ্রীসের অমন নামডাকের আসল কারণটা হলো মর্মর-পাথরের উপর ভাস্কর্য। সত্যিই অপরূপ এই ভাস্কর্য। তাই ভাস্কর্যের কথা কিছুটা বলা দরকার।

গ্রীক ভাস্কর্যের কথা বুঝতে হলে সাধারণভাবে গ্রীকদের জীবন সম্বন্ধেও দু-একটা কথা মনে রাখা দরকার।

আমরা যাকে বলি অ্যাথেলেটিক্ স্পোর্টস্,—দৌড়-ঝাঁপ, খেলাধুলো, নানারকম প্রতিযোগিতা,—গ্রীকদের সমাজে তার কদর ছিলো দারুণ বেশি। এই সব প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদের শরীরের গড়ন স্বভাবতই চমৎকার হতো। শুধু তাই নয়; প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার সময় তাঁরা গায়ে বড়ো একটা জামাকাপড়ের বালাই রাখতেন না। ফলে, ওদেশের তখনকার শিল্পীদের একটা খুব বড়ো সুযোগ ঘটতো; তাঁরা হামেশাই দেখতে পেতেন গড়নের দিক থেকে চমৎকার মানুষের পুরো শরীর। আর, তাই ওই সুস্থ-সবল চমৎকার শরীর-গুলির প্রতিমূর্তি আঁকবার দিকে তাঁদের ভাস্কর্যের অতোটা ঝোঁক। কিন্তু এই সব মূর্তি গড়বার কাজে তাঁরা অনেক রকম নিয়ম-কানুন, হিসেব-পত্র করে চলতেন। নানান দিক থেকে গ্রীকদের মধ্যে বিজ্ঞানের উপর খুব ঝোঁক ছিলো। তাই ভাস্কর্যের বেলাতেও তাঁরা অতো সব নিয়ম-কানুন রপ্ত করতে চাইতেন। তাঁরা ভাবতেন, মানুষের মূর্তি গড়বার সময় যে-কোনো কারুর চেহারার নকল করা ঠিক নয়। তার বদলে গড়তে হবে আদর্শ মানুষের মূর্তি, বা মানুষের আদর্শ মূর্তি। আদর্শ মানে? মানে, যা হলে একেবারে নিখুঁত মানুষের চেহারা হয়ে ওঠে। অবশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত মানুষ তো আর কেউ কখনো চোখে দেখে নি। কিন্তু সে-বিষয়ে শিল্পীদের পাকা-পোক্ত হিসেব ছিলো—লম্বা-চওড়া কী রকম হওয়া উচিত, চোখ-মুখ, হাত-পা কী রকম হওয়া উচিত, অর্থাৎ কিনা যে-রকমটি হলে পুরো মানুষটা একেবারে নির্ভুল সুন্দর দেখতে হয়। তাই

কোনো একজন বাস্তব মানুষ দেখে মূর্তি গড়বার সময় শিল্পীরা ওই বাস্তব মানুষের চেহারাকে প্রয়োজনমতো শুধরে নিতেন, খুঁত-ত্রুটি বাদ দিয়ে নিখুঁত করে নিতেন।

আর ঠিক এই কারণেই ওঁদের গড়া দেবদেবার মূর্তির সঙ্গে স্মরণীয় নরনারীর মূর্তির (মানুষের মূর্তি বলতে প্রধানত অবশ্যই বীরপুরুষদের মূর্তির) খুব একটা তফাত থাকতো না। কী করে থাকবে? স্মরণীয় মানুষদের মূর্তি গড়বার সময় আদর্শ করে গড়বার চেষ্টা, আবার দেবদেবীর মূর্তি গড়বার চেষ্টাও একেবারে অপরূপ আর নিখুঁত মানুষের মতো করে। গ্রীকরা যে-সব দেবদেবীতে বিশ্বাস করতো হালচালের দিক থেকে তারা একেবারে মানুষের মতোই; শুধু তাই নয়, মর্ত্যের মানুষদের সঙ্গে স্বর্গের ওই বাসিন্দাদের হরেক রকম আদানপ্রদানও হরদম চলতো।

ধরা যাক, দেবী ভেনাসের কোনো একটি মূর্তি। সে-মূর্তি আসলে নিখুঁত সুন্দরী মানবীর মূর্তির মতোই।

॥ প্রথম আমলের খ্রীষ্টান ছবি ॥

ইউরোপের ইতিহাসে গ্রীক সভ্যতার পর রোমান সাম্রাজ্যের কাহিনী। কিন্তু শিল্পের দিক থেকে এই রোমান সাম্রাজ্যের যুগে গ্রীক-যুগের তুলনায় খুব বড়ো রকমের কোনো কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই আমরা আমাদের এই ছোট্ট আলোচনায় রোমান যুগটার কথা বাদ দিয়েই এগুবো।

রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বার সময়ই খ্রীষ্টধর্মের শুরু। প্রথম দিকে রোমান রাজাদের অত্যাচারে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা লুকিয়ে থাকতেন; মাটির তলায় ঘর কেটে, গোপনে, সাধনভজন করতেন। সেই সময়টায় তাঁরা এই গোপন ঘরগুলিতে বসে খ্রীষ্টধর্মের নানা রকম কাহিনী অবলম্বন করে কিছুকিছু ছবি আঁকতেন।

কিন্তু খ্রীষ্টধর্মকে প্রকাশ্য ভাবে অবলম্বন করে ইউরোপের ইতিহাসে খুব জাঁকালো ধরনের শিল্প গড়ে উঠলো কন্‌স্‌টান্‌টাইনের সময় থেকে। এই যুগটাকে বলে বাইজান্‌টাইন শিল্পের যুগ।

॥ বাইজান্‌টাইন্ আ ॥

প্রথমে বাইজান্‌টাইন্ কথাটির মানে স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া যাক।

রোমান সাম্রাজ্য বাড়তে বাড়তে এতো বড়ো হয়ে গিয়েছিলো যে শেষ পর্যন্ত তা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—একটি হলো পশ্চিম ভাগ, আর একটি হলো পুব-ভাগ। ক্রমশ পশ্চিম ভাগের শক্তি কমতে থাকে, বাড়তে থাকে পুব-ভাগের শক্তি। শেষ পর্যন্ত ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কন্‌সটান্‌টাইন রোম থেকে আজকালকার কন্‌স্‌টান্‌টিনোপল্ শহরে রাজধানী সরিয়ে আনেন; আগে এই শহরটির নাম ছিলো বাইজান্‌টিয়াম। রাজা কন্‌স্‌টনটাইন শুধুই যে শহরটিকে নতুন করে গড়লেন তাই নয়, তার নতুন নামকরণও করলেন—কন্‌স্টানটিনোপল্। কিন্তু তবুও

বাইজান্‌টিয়াম্‌ বলে ওই পুরোনো নামটাই ইতিহাসে টিকে গিয়েছে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী আক্রমণের ফলে কন্‌স্‌টানটিনোপল্‌ ধ্বংস হয়।

তাহলে বাইজান্‌টাইন্‌ আর্টের যুগটা মোটামুটি হলো ৩৩০ থেকে ১৪৫৩ পর্যন্ত।

রাজা কন্‌স্‌টান্‌টাইন খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেকালের খ্রীষ্টধর্মই হলো বাইজান্‌টাইন আর্টের প্রাণবস্তু। রাজ-উৎসাহে বিরাট-বিরাট গির্জা তৈরি হলো, সেই গির্জায় খুব জমকালো কারুকার্য। তাছাড়া, খ্রীষ্টধর্মমূলক অজস্র মূর্তি এবং ছবিও। গ্রীক-শিল্পের সঙ্গে এই যুগটির শিল্পে অনেক তফাত।

বাইজাইন্‌টাইন শিল্প খুবই জমকালো। রাজার মাহাত্ম্য আর ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচারই এ-শিল্পের প্রাণবস্তু। তাই পবিত্র শিল্পও—আসলে, ইউরোপের ইতিহাসে এমন নির্ভেজাল ধর্মপ্রাণ বা পবিত্র শিল্প আর কোনো যুগেই হয় নি। এ-শিল্পের সঙ্গে মরলোকের মানুষদের এতোটুকুও সম্পর্ক নেই—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-আবেগ, কিছুই এ-শিল্পকে স্পর্শ করতে পারে নি।

আর তাই যতো জমকালোই হোক না কেন, বাইজানটাইন শিল্পের মতো অমন নির্জীব, অমন গোঁড়া, অমন কৃত্রিম শিল্পও ইউরোপের ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি।

মানুষগুলো যেন শক্ত কাঠের মতো। তাদের টানা সরু চোখ, কিন্তু সে-চোখে কোনো রকম ভাষা নেই, পরিচয় নেই কোনো আবেগ-অনুভূতির। আসলে, রাজার মহিমা আর

ঈশ্বরের মহিমা—এই দুইএর চাপে বাইজান্‌টাইন শিল্পের প্রাণশক্তি যেন পিষে মারা গেলো।

॥ ফ্লরেন্স-এর নতুন শিল্প ॥

তাছাড়া, বাইজান্‌টাইন ছবির কৌশলটারও সংকীর্ণতা ছিলো। কোন ধরনের কৌশল? তাকে বলে মোজেইক্। রঙিন পাথরের কুঁচি সাজিয়ে নক্সা করলে তাকে মোজেইক বলে। আজকাল অনেক বাড়ির মেঝেতেই মোজেইকের কাজ দেখা যায়। বাইজান্‌টাইন ছবিও তৈরি করা হতো এইভাবে রঙিন পাথরের কুচো বসিয়ে বসিয়ে।

বুঝতেই পারছো, এইভাবে ছবি তৈরি করবার কাজে শিল্পীর স্বাধীনতা কতো কম। ছবিগুলির মধ্যেও একটা কাঠিন্যের ভাব না এসে পারে না।

তার বদলে গোলা রঙ আর বুরুশ দিয়ে ছবি আঁকলে ছবি আঁকবার স্বাধীনতা অনেক বেশি হয়। ছবির মধ্যে নিটোল লাবণ্যও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

গির্জার দেয়ালে গোলা রঙ আর বুরুশ ব্যবহার করে দুভাবে ছবি আঁকা যেতে পারে। এক হলো, জলে গুঁড়ো রঙ গুলে আঁকতে হবে। কিন্তু তা আঁকতে হলে দেয়ালে পলেস্তারা করবার প্রায় সঙ্গেসঙ্গে—অর্থাৎ, পলেস্তারা ভিজে থাকতে থাকতেই—আঁকতে হবে। এইভাবে আঁকাকে বলে ফ্রেস্কো। আর এক হলো, চট্‌চটে আঠার সঙ্গে গুঁড়ো রঙ মিলিয়ে বুরুশ

ব্যবহার করে আঁকা। তাহলে শুকনো জমির ওপরও আঁকা চলবে। এইভাবে আঁকাকে বলে টেম্পেরা।

ফ্লরেন্স-এর শিল্পীরা মোজেইক ছেড়ে রঙ-বুরুশের দিকে এগুলেন। ফ্লরেন্স হলো ইতালির একটি শহর। নামটার শব্দার্থ—ফুলের শহর। নতুন যুগের শিল্পীরা প্রধানতই ফ্রেস্কোর কাজ করেছেন ; কিন্তু তাছাড়াও তাঁদের টেম্পেরার কাজও আছে।

ইতালির এই শহরটিকে কেন্দ্র করে যে-সব চিত্রকরেরা ইউরোপীয় চিত্রের ইতিহাসে যুগান্তর আনলেন এখানে তাঁদের মধ্যে দু-একজনের নাম করা যাক।

জত্তো (Giotto)। জন্ম ১২৬৬, মৃত্যু ১৩৩৭। জত্তোই সব-প্রথম গির্জার ছবিতে ফ্রেস্কোর কাজ ভালোভাবে প্রবর্তন করেন।

ফ্রা আঞ্জেলিকো (Fra Angelico)। জন্ম ১৩৮৭, মৃত্যু ১৪৫৫। ইনি ছিলেন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী। থাকতেন সন্ন্যাসীদের মঠে। সেই মঠের খুপরিগুলির দেয়ালে ইনি বাইব্‌ল্-এর নানা উপাখ্যান এঁকেছেন। তাঁর ছবিতে এক অপরূপ পবিত্র ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়।

কিন্তু ইটালির এই নতুন যুগের শিল্পীদের মধ্যে যিনি সবপ্রথম শুধু খ্রীষ্টধর্মমূলক ছবি না এঁকে অন্যান্য বিষয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন তাঁর নাম হলো বতিচেল্লি (Botticelli)। জন্ম ১৪৪৪, মৃত্যু ১৫১০। তিনি অবশ্য তুলি নিয়ে কাজ করবার আগে ছেনি নিয়ে কাজ করতেন—অর্থাৎ শুরু করেছিলেন ভাস্কর ও স্বর্ণকার হিসেবে। আর তাই তিনি যখন ছবি আঁকতে শুরু করলেন তখন তাঁর ছবিতে একটা পাথরের কাজের ভাব, বা ধাতুর

কাজের ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। তাঁর ছবির মেয়েরা বড়ো বিখ্যাত—ছিপছিপে লম্বা সব চেহারা, এমন শৌখিন আর কোমল দেখতে যে অবাক হয়ে যেতে হয়!

॥ তেল-রঙের ছবি ॥

তাহলে বাইজানটাইন যুগে ছবি তৈরির কায়দাটা ছিলো মোজেইক্। তারপর ফ্লরেন্স-এর শিল্পীরা নতুন কায়দার প্রচলন করেন, —ফ্রেস্কো আর টেম্পেরা। তারপর শুরু হলো তেল-রঙের ছবি—আমরা যাকে বলি অয়েল্-পেন্টিং। বলাই বাহুল্য, ইউরোপের শিল্প-ইতিহাসে এই তেল-রঙ ব্যবহারের আবিষ্কার একটা বিরাট ব্যাপার। কেননা, এর পরের যুগে জগৎ-বিখ্যাত শিল্পীরা অনেক সময়ই তেল-রঙ ব্যবহার করে ছবি এঁকেছেন।

তেল-রঙ বের করলেন কে? দুই ভাই—একজনের নাম হুবার্ট ভ্যান্ ডাইক্, আর একজনের নাম জন্ ভ্যান্ ডাইক। দাদা হুবার্ট জন্মেছিলেন ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে; জন তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোটো।

তখনকার কালে ইতালিই ছিলো ইউরোপীয় শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। যতো বড়ো বড়ো শিল্পী, সবাই ইতালির। কিন্তু এই ভ্যান্-ডাইক্ ভাইয়েরা ছিলেন নেদারল্যাণ্ড-এর লোক।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের তেমন ভালো জীবনী কেউই লিখে যান নি। তাই, এঁরা ছবির কলাকৌশলের ব্যাপারে এমন আশ্চর্য আবিষ্কার ঠিক কী করে করলেন সে-কথা

আমরা তেমন স্পষ্টভাবে জানতে পারি না। এ-বিষয়ে একটা গল্প চালু আছে। গল্পটা কতোখানি সত্যি তা জানা নেই।

শোনা যায়, ছোটোভাই জন একবার অনেকদিন ধরে খেটেখুটে একটা খুব ভালো ছবি আঁকলেন। তারপর, ছবিটার ওপর ভার্নিস মাখিয়ে রোদে শুকোতে দিলেন। কিন্তু রোদের চোটে ছবিটা ফেটে চৌচির হয়ে গেলো; মাঠে মারা গেলো অতোদিনকার অমন খাটুনি। তাইতে খুব বিরক্ত হয়ে জন ভাবলেন, এমনভাবে রঙ তৈরি করতে হবে যা সহজে নষ্ট হয় না। এই নিয়ে তিনি অনেকদিন ধরে নানা পরীক্ষা চালান। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন, তিসির তেল আর বাদাম তেলের সঙ্গে রঙের গুঁড়ো মিশিয়ে আঁকার রঙ তৈরি করলে এই তেল-রঙ শুধুই যে অনেক পাকা হয় তাই নয়—টেম্পেরায় গোলা রঙের চেয়ে তেল-রঙ অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়। তাছাড়া এই তেল-রঙ জল লাগলে নষ্ট হয় না।

এইভাবেই নাকি তেল-রঙের ব্যবহার আবিষ্কার হয়। গল্পটা ঠিক কিনা তা কে জানে!

॥ লিঅনার্দো দা ভিঞ্চি ॥

আমরা কথায় বলি, জিনিয়াস্—অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মানুষ। কিন্তু লিঅনার্দো-কে শুধু যদি জিনিয়াস্ বলা হয় তাহলে কিছুই বলা হবে না। কেননা, তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় শুধুমাত্র শিল্পের ক্ষেত্রে নয়, আরো নানা ক্ষেত্রে। গণিতশাস্ত্র,

এঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাল্‌কেমি ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়েই তাঁর কীর্তি স্মরণীয়।

জীবনে যদি তিনি তুলি-বুরুশ নাও ধরতেন তাহলেও আজ আমরা তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলে ঘোষণা করতাম; তিনি যদি ছেনিও জীবনে না ধরতেন তাহলে আজ আমরা তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে চিনতাম—কিন্তু তিনি তুলিও ধরেছিলেন, ছেনিও ধরেছিলেন, করেছিলেন বিজ্ঞানের চর্চাও।

তবু যার জন্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি সম্মান তা হলো তাঁর আঁকা ছবিই। কিন্তু এই ছবি আঁকবার ব্যাপারেও যে তিনি কীভাবে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন তা শুধুমাত্র একটি কথা থেকেই আন্দাজ করতে হবে। মানুষের ছবি আঁকতে গেলে মানুষের শরীরের কথা তন্নতন্ন করে জানা দরকার—এই জ্ঞানকে বলা হয় অ্যানাটমি। মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অ্যানাটমি শেখে। কী করে শেখে? মৃতদেহ কাটতে কাটতে। কিন্তু লিঅনার্দোর সময়ে ইউরোপেও এমন কুসংস্কারের রাজত্ব ছিলো যে লোকে ভাবতো মড়া কাটলে জাত যাবে। তাই ডাক্তারি শেখবার সময়েও ছাত্ররা মড়া ছুঁতো না, এমনকি অ্যানাটমির মাস্টার-মশাইরা নিজেরাও কখনো মড়া কাটতেন না। তাহলে কি শরীর-বিদ্যা শেখা যায়? শেখা যায় না। আসলে, শরীর-বিদ্যা বলতে তখন মানুষের শরীর সম্বন্ধে কতকগুলো মনগড়া ভুল ধারণা ছিলো।

লিঅনার্দো কিন্তু তাতে মোটেই খুশি নন। তিনি নিজে হাতে অনেকগুলি মড়া কাটলেন—মানুষের শরীরের ভেতরকার

খবরটা স্পষ্টভাবে জানবার জন্যে। আর তাই, মানুষের শরীর সম্বন্ধে এইভাবে নতুন জ্ঞান পাবার পথ খুলে দিয়ে লিঅনার্দো আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকেও সত্যিকারের বিজ্ঞান হয়ে উঠতে সাহায্য করলেন।

এ-হলো তাঁর জীবনের একটা টুকরো ঘটনা। এমনতরো ঘটনা দেদার রয়েছে।

ইতালিতে, ফ্লরেন্স শহরের কাছে, ভিঞ্চি বলে এক গ্রাম। সেই গ্রামে ১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে লিঅনার্দোর জন্ম হয়; তাঁর নামের সঙ্গে ওই ছোট্ট গ্রামটির নামও জগৎ-বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

এতোটুকু বয়স থেকেই নানান দিকে লিঅনার্দোর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেতে লাগলো। কিন্তু কী রকম যেন ছটফটে ধরনের ছেলে! কোনো একটা বিষয় শিখতে শুরু করে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই তাতে রীতিমতো পারদর্শী হয়ে উঠতেন, কিন্তু তার পরই তিনি সে-বিষয়টিকে ছেড়ে দিয়ে অন্য আর এক বিষয়ের চর্চা শুরু করতেন! কেবল, সারা জীবন ধরে তিনি একটি বিষয় সম্বন্ধে একনিষ্ঠ উৎসাহের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন—সে-বিষয়টি হলো চিত্রকলা।

ইতালিতে তখন ভেরোচ্চিও বলে একজন চিত্রকর ছিলেন। খুব তাঁর নামডাক। বালক লিঅনার্দো তাঁরই কাছে শিক্ষানবিশি করছিলেন। এ-হেন ভেরোচ্চিও-র ওপর ভার পড়লো এক গির্জায় একটা মস্ত ছবি আঁকবার। গুরুদেব ভাবলেন, বালক লিঅনার্দোকে একটুখানি সুযোগ দেওয়া যাক—লিঅনার্দোকে বললেন ওই বড়ো ছবির একজায়গায় একটি পরী আঁকতে। তাঁর

পরীটি আঁকা যেদিন শেষ হলো সেদিন সকলে একেবারে স্তম্ভিত ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কারুরই আর যেন নিশ্বাস পড়ে না, এমন অপরূপ। ভেরোচ্চিও দেখলেন, অতোটুকু ছেলে যে-রকম ছবি এঁকেছে তা তিনি নিজে কোনো দিনই আঁকতে পারবেন না। তাই তারপর তিনি জীবনে আর কখনো তুলি-বুরুশ হাতে নেন নি।

হৈ-চৈ পড়ে গেলো সারা ইতালিতে। লিঅনার্দো দা ভিঞ্চি! লিঅনার্দো দা ভিঞ্চি! আবির্ভাব হয়েছে এক আশ্চর্য শিল্পীর।

মিলান শহর থেকে আমন্ত্রণ এলো। সেইখানেই তিনি তাঁর "লাস্ট সাপার" বলে বিখ্যাত ছবিটি এঁকেছিলেন। কিন্তু তড়ি-ঘড়িতে ছবি এঁকে ফেলা তাঁর ধাতে ছিলো না। মিলান-এ গিয়ে তিনি খান-দান, ঘুরে বেড়ান। একদিন সেখানকার ডিউক তাঁকে বললেন, ব্যাপার কি—অনর্থক সময় নষ্ট করছেন কেন? জবাবে লিঅনার্দো শান্ত গলায় বললেন, ছবিটি শুরু করার আগে ছবির প্রত্যেকটি মুখ স্পষ্টভাবে ভেবে নেওয়া দরকার। কিন্তু জুডাস্-এর মতো একটা মুখ ভেবে ঠিক করা বড়ো কঠিন—প্রভু যীশুর কাছ থেকে অতো সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও যে-লোক শেষ পর্যন্ত যীশুর বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলো তার মুখটা ভাবতে পারা তো সহজ কথা নয়। তবে, লিঅনার্দো বলে চললেন, আপনার সময় বাঁচাবার জন্যে ভাবছি, স্থানীয় প্রধান-পুরোহিতের মুখটিকেই জুডাসের মুখ হিসেবে ব্যবহার করে ছবিটা শুরু করে ফেলি। এই শান্ত বিদ্রূপের দরুন ডিউকের মুখ একেবারে চুন। ভাবলেন, কাজ নেই ঘাঁটিয়ে—যখন খুশি ছবি আঁকলেই হবে।

লিঅনার্দোর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবিটির নাম কে না জানে। মোনালিসা। আজ যদি তুমি ফরাসী দেশে যাও আর ছবির কোনো সমঝদারকে শুধোও, "আপনাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ বলতে কী?", তাহলে তিনি হয়তো বুক ফুলিয়ে বলবেন, "লুভ্‌রে বলে আমাদের আর্ট-গ্যালারিতে লিঅনার্দোর মোনালিসা আছে।" মাপজোপের দিক থেকে ছবিটি খুব বড়ো নয়। তিন ফুট উচু আর দু ফুট চার ইঞ্চি চওড়া। একটি মহিলার ছবি— তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। এ-হাসির মানে যে ঠিক কী তা ভাবতে ভাবতে সকলেই বিস্মিত হয়ে যায়! পটভূমিতে এক-টুকরো প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু তার পুরোটাই হলো ছবির মহিলাটির মনের ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে।

সমঝদাররা বলেন, এইখানেই লিঅনার্দোর প্রতিভার আসল পরিচয়। বাইরের পৃথিবীর চেয়ে মানসজগতের খবর দেওয়াই তাঁর ছবির আসল উদ্দেশ্য। আর, মানুষের মন যে কী অপরূপ, কী বিচিত্র, সে-সম্বন্ধে আমরা চমকে সচেতন হই লিঅনার্দোর ছবি দেখতে দেখতে।

।। মাইকেল এঞ্জেলো ।।

মাইকেল এঞ্জেলোর জন্ম হয় ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

নেহাত ছোট্ট বয়েস থেকেই ভাস্কর্যের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা দিলো। তাঁর বাবা কিন্তু এ-কথা মোটেই বুঝতে পারেন নি যে বড়ো হলে এই ছেলে কতো বড়ো শিল্পী হবে। তাই ছেলে

মিছিমিছি সময় নষ্ট করছে ভেবে তিনি তাকে মাঝে মাঝে উত্তম-মধ্যম লাগাতেন। কিন্তু তাতে কিছুই এলো-গেলো না। মাইকেল এঞ্জেলো শেষ পর্যন্ত শিল্পীই হলেন।

আর সত্যিই, যেমন-তেমন শিল্পী নয়।

খুব কম বয়েসেই তিনি কিউপিডের, অর্থাৎ গ্রীক পুরাণের মদন-দেবের, এক মর্মর-মূর্তি তৈরি করেন। এক ব্যাটা জোচ্চার ব্যাবসাদার করলো কি,—মূর্তিটি নিয়ে গেলো নামজাদা এক সমঝদারের কাছে। বললো, গ্রীসের এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছে। কাজটা এমনই অসামান্য হয়েছিলো যে সমঝদার-মশাই বোকা বনে গেলেন; ভাবলেন সত্যিই বুঝি গ্রীক যুগেরই ভাস্কর্য। অনেক দাম দিয়ে মূর্তিটি তিনি কিনে নিলেন।

আর একটা গল্প বলি। মাইকেল এঞ্জেলোর তখন মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়েস। ফ্লরেন্স-এ এক খোদাইকরের কারখানায় তিনি কাজ করতে গেলেন। সেখানে ১৮ ফুট উঁচু একটা মার্বেল পাথরের চাঁই ছিলো। চল্লিশ বছর আগে আর-এক ভাস্কর পাথরটা থেকে এক মূর্তি গড়তে গিয়ে পাথরটাকে এলোমেলো ভাবে জখম করে রেখেছিলো। ওটা থেকে যে কিছু হতে পারে তা আর কেউ ভাবতে পারতো না। তাই চল্লিশ বছর ধরে পাথরটা পড়ে ছিলো ওই অবস্থাতেই। মাইকেল এঞ্জেলো পুরো দুটি বছর ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে পাথরটার ওপরে কাজ চালালেন। তারপর একদিন পর্দা সরানো হলো পাথরটির ওপর থেকে! যারা চেয়ে দেখলো তারা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তাদের

সামনে রয়েছে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ মর্মর-মূর্তি! এটি হলো মাইকেল এঞ্জেলোর আশ্চর্য কীর্তি—ডেভিডের মূর্তি।

আটাশ বছর বয়েসেই তিনি পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলে স্বীকৃত হলেন।

এ-হেন ভাস্করকে কিন্তু ছেনি ছেড়ে বুরুশ ধরতে হলো। ১০ই মার্চ, ১৫০৮ সালে তিনি খাতায় লিখলেন, "আমি, ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলো গির্জায় ছবি আঁকা শুরু করতে বাধ্য হলাম।" সত্যি বলতে কি, তার আগে পর্যন্ত তিনি শুধু মূর্তিই গড়েছেন, ছবি আঁকার ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানতেন না।

তাহলে, তিনি ছবি আঁকতে গেলেন কেন? সাধ করে নয়। তখনকার পোপ, বা সবচেয়ে বড়ো খ্রীষ্টান পুরোহিত, জোর করে তাঁকে এই কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন।

কিন্তু পোপেরই বা এ-রকম ভিমরতি ধরলো কেন? যে-লোক মূর্তি খোদাই করে—জীবনে কখনো ছবি আঁকে নি,—তাকে কিনা ঘাড় ধরে ছবি আঁকতে পাঠানো! আসলে, সবটাই এক চক্রান্তের ব্যাপার। ইতালিতে তখন ব্রামান্তে বলে আর একজন ভাস্কর ছিলো; তার ফন্দি হলো মাইকেল এঞ্জেলোকে খুব খানিকটা অপদস্থ করে দেওয়া যাক। ব্রামান্তে ছিলো পোপ-এর খুব পেয়ারের লোক! সে গিয়ে তাই পোপ-কে ভজালো, সিস্টাইন্ চ্যাপেল বলে গির্জার কড়িকাঠে ফ্রেস্কো আঁকবার হুকুম দিয়ে মাইকেল এঞ্জেলোকে অপদস্থ করে দেওয়ার জন্যে। পোপও ভারি পাজি লোক ছিলো। মাইকেল এঞ্জেলো কতো কাকুতি মিনতি করলেন। তিনি এর আগে কখনো ছবি আঁকেন নি।

তাঁকে এ-কাজ করবার জন্যে জবরদস্তি করা যেন না হয়। কিন্তু পোপ-এর মন গললো না। মাইকেল এঞ্জেলো বুরুশ ধরতে বাধ্য হলেন।

ছোট্টো এতোটুকু একটা ছবি নয়। গির্জার কড়িকাঠটির মাপজোপ হলো পাঁচ হাজার বর্গফিট। উঁচু ভারা বেঁধে কাজ করতে হবে; এতো উঁচু যে সেখান থেকে মেঝের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। শুধু তাই নয়। ভারার ওপর সারাক্ষণ চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে কাজ করতে হবে। নইলে মানুষ কড়িকাঠের গায়ে ছবি আঁকবে কেমন করে? আর, মনে আছে তো, ফ্রেস্কোর কাজ মানে কাঁচা পলেস্তারার ওপরে কাজ—পলেস্তারা ভিজে থাকতে থাকতে ছবি এঁকে ফেলতে হবে।

পোপ-এর ফরমাস হলো, পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন দৃশ্য এঁকে ভরিয়ে ফেলতে হবে কড়িকাঠ।

মাইকেল এঞ্জেলো প্রথম ছবিটি আঁকতে গেলেন। আগে কখনো আঁকেন নি! পারবেন কেন? সেটা নষ্ট হলো। আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে হলো মাইকেল এঞ্জেলোকে।

পুরো চার বছর ধরে রাত নেই দিন নেই মাইকেল এঞ্জেলো ভারায় শুয়ে শুয়ে ছবি এঁকে চললেন। দেরি হচ্ছে বলে পোপ দাঁত খিঁচোয়, কিন্তু পয়সাকড়ি দিতে চায় না। ভয়ানক অর্থাভাব। আত্মীয়রা দেশ থেকে পয়সা-পাঠাও পয়সা-পাঠাও করে পাগল করে দেয়। আর উঁচু ভারার ওপর চিত হয়ে শুয়ে মাইকেল এঞ্জেলো অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেন।

১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বললেন, কাজ শেষ হয়েছে। খোলা হলো গির্জার দরজা। কাজ দেখতে এলেন অনেকে।

যাঁরা এলেন তাঁদের আর চোখের পলক পড়ে না! তাঁদের মাথার উপরে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ছবি। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন রাফেল। রাফেল বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—এই ছবিটি দেখবার আগে আমার মৃত্যু হয়নি।

কিন্তু যিনি ছবিটি আঁকলেন? মাইকেল এঞ্জেলো? তাঁর চোখ তখন প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর পর বছর কয়েক তিনি এমনকি বইয়ের হরফ পর্যন্ত পড়তে পারেন নি। আর পুরো চার বছর ধরে অমন একটানা চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে কাজ করতে করতে তাঁর কাঁধ প্রায় কুঁজো হয়ে গিয়েছে! তখন তাঁর বয়েস মাত্র ৩৭ বছর। কিন্তু এটুকু বয়েসেই তিনি একেবারে বুড়ো হয়ে গেলেন।

অবশ্য মাইকেল এঞ্জেলো আরো অনেকদিন বেঁচেছিলেন—অষ্ট-আশি বছর বয়েস পর্যন্ত। তিনি আরো অনেক অসামান্য শিল্প রচনা করেছিলেন। কিন্তু জীবনে তাঁর না ছিলো সুখ, না সচ্ছলতা। দারিদ্র্য আর অশান্তিতে কেটেছিলো তাঁর জীবন।

অতো বড়ো শিল্পীর এ-রকম দশা! ভাবতে খুব দুঃখ হয় না?

॥ রাফেইল ॥

রাফেইল ছিলেন মাইকেল এঞ্জেলোরই সমসাময়িক। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তবে তাঁর জীবন মাইকেল এঞ্জেলোর মতো দীর্ঘও ছিলো না, দুঃখে ভরাও নয়। মাত্র ৩৭ বছর বয়েসে তিনি মারা যান। কিন্তু একটু বয়েসের মধ্যেই এতো ছবি—

অমন আশ্চর্য অপরূপ ছবি—আর কোনো শিল্পীই এঁকে যান নি।

রাফেইল অনেকগুলি ম্যাডোনার ছবি এঁকেছেন। ম্যাডোনা মানে হলো, যীশুখ্রীষ্ট-কোলে কুমারী মেরি-মাতা। তাঁর আঁকা এই ম্যাডোনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছবিটির নাম সিস্‌টাইন ম্যাডোনা। কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের মায়ের ছবি হলেও কোনো মানবীকে দেখে আঁকা নিশ্চয়ই। রাফেইল কার চেহারা থেকে এই সিস্‌টাইন্‌ ম্যাডোনা আঁকেন? সে হলো এক চাষীর-বৌ। একবার রাফেইল এক গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়লো কচি ছেলে-কোলে এক চাষীর বৌ—আর একটি ছোট ছেলে মায়ের জামার আঁচল ধরে টানছে। রাফেইলের মনে হলো, এমন অপরূপ মাতৃমূর্তি তিনি আর কখনো দেখেন নি! কিন্তু তাঁর সঙ্গে তখন আঁকবার সরঞ্জাম ছিলো না। অগত্যা পেনসিল দিয়ে হাতের কাছে যা পেলেন তারই উপর তিনি চাষীর বৌ-এর একটা নক্‌সা এঁকে ফেললেন। পরে, সেই নক্‌সাটি থেকেই তিনি আঁকলেন তাঁর বিখ্যাত সিস্‌টাইন ম্যাডোনা।

এমন ছবি নাকি পৃথিবীতে আর নেই। —ছবির সবচাইতে নামজাদা সমঝদারদের মধ্যে কেউ কেউ এ-কথা বলেন।

॥ রুবেন্‌স্‌ ও ফ্লেমিশ স্কুল ॥

আজকালকার মানচিত্রের উত্তর ফ্রান্সের কিছুটা অংশ, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ডের-এর কিছু অংশ নিয়ে যে-এলাকা, মধ্যযুগে তার নাম ছিলো ফ্লান্‌ডার্‌স্‌। এ-দেশের শিল্পীদের তাই ফ্লেমিশ

গোষ্ঠীর শিল্পী বলা হয়। ফ্লেমিশ গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন রুবেন্‌স্ ও তাঁর শিষ্য ভ্যান্‌ডাইক।

অ্যান্টওয়ারপ্ শহরে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রুবেন্‌স্-এর জন্ম।

তিনি অনেকদিন ইতালিতে থেকেছিলেন এবং ইতালির শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অনেক ছবি তিনি নকল করেছিলেন ছবি-আঁকায় হাত পাকাবার আশায়। ফলে, তাঁর ছবিতে ইতালিয়ান ছবির প্রভাব তো পড়বার কথাই। বস্তুত ফ্লেমিশ শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইতালীয় ছবির লালিত্য ও উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার দেশে নিয়ে এলেন।

ইউরোপের জগৎবিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে রুবেন্‌স্-ই প্রথম প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এঁকেছিলেন। পরে অবশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকিয়ে হিসেবে বিশেষ করে একজন ইংরেজ শিল্পী খুব নাম করেছেন। তিনি হলেন কন্‌স্‌টেবল্ (Constable : ১৭৭৬-১৮৩৭)।

রুবেন্‌স্-এর জীবন ছিলো খুবই বিচিত্র। অতো বড়ো শিল্পী হয়েও তিনি নানা রকম রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই নিয়ে একটা মজার গল্প আছে।

একবার স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপ রুবেন্‌স্‌কে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রদূত হিসেবে : তখন স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে-সন্ধিপত্র হবে রুবেন্‌স্ তার শর্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। ইংল্যাণ্ডে থাকবার সময় তিনি হোয়াইট্‌হলের একটি ঘরের কড়িকাঠে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। একদিন, তিনি যখন ছবি আঁকছেন,

তখন একজন তাঁকে শুধোলো, সম্মানিত রাজদূত মহাশয় কি মাঝে মাঝে এইভাবে মনের খেয়াল-খুশি মেটাতে ছবি এঁকে থাকেন? উত্তরে রুবেন্‌স্ বললেন, তা নয়। আসলে একজন শিল্পীই মনের খেয়াল-খুশির ঝোঁকে রাষ্ট্রদূতের কাজ করে থাকে।

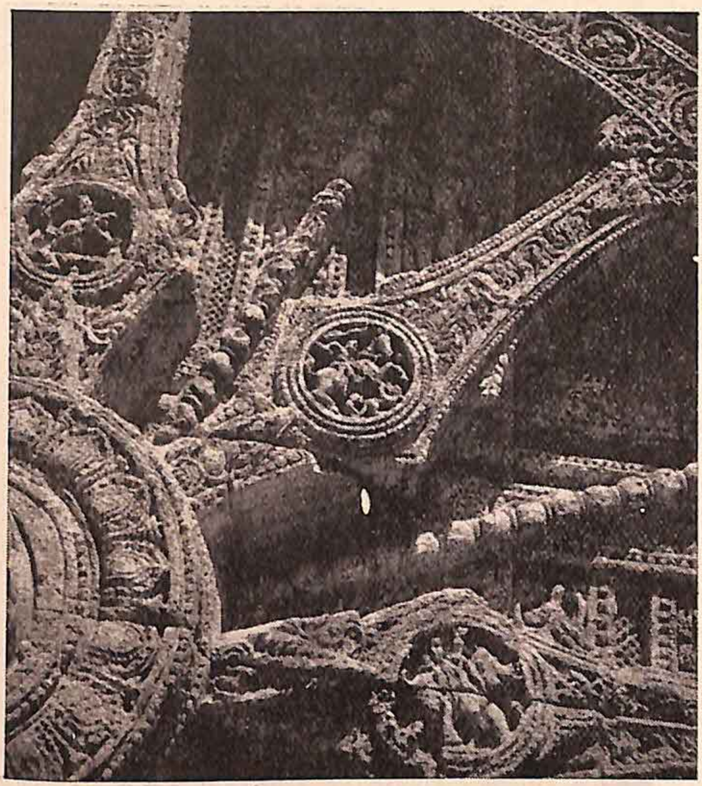
ফলে বুঝতেই পারছো, রুবেন্‌স্‌কে ঠিকমতো বুঝতে পারা বড়ো কঠিন। একদিক থেকে মনে হয়, এমন পাকা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শিল্পী হবেন কী করে? কেননা আমরা সাধারণত মনে করি, শিল্পী-মেজাজের সঙ্গে বিষয়বুদ্ধি খাপ খায় না। কিন্তু রুবেন্‌স্-এর কথা ভাবলে মনে হয়, আমাদের ওই সাধারণ ধারণাটা হয়তো ঠিক নয়। কেননা, রুবেন্‌স্ একদিকে যে-রকম অসামান্য বড়ো শিল্পী ছিলেন আবার অপর দিকে তেমনি বৈষয়িক মানুষও ছিলেন। বিষয়-বুদ্ধিটা কী রকম তার একটু নমুনা দিই। একজন সমালোচক লিখছেন, রুবেন্‌স্ ছবি আঁকতেন বিক্রি করবার জন্যে; আর এ-ব্যাপারটা এমন খোলাখুলি, এমন সরাসরি ছিলো যে সেদিক থেকে তাঁর পক্ষে ছবি আঁকা আর ব্যবসাদারের পক্ষে ব্যবসাদারি করা—দুইই যেন সমান। যে-রকম দর পাবো সেই রকমের ছবি আঁকবো, ভাবখানা অনেকটা এই রকম। তার মানে এই নয় যে, কম টাকা পাবার সম্ভাবনা থাকলে তিনি ইচ্ছে করে খারাপ ছবি আঁকতেন। তা নয়। তবে, ছবিটার মাপ কী রকম হবে, কতোখানি খাটুনির জটিলতা থাকবে—এ-সব ব্যাপার খুব সোজাসুজি ছবিটার দরের উপর নির্ভর করতো।

এই পেশাদারি মনোভাবটার জন্যেই হয়তো তিনি অতো অজস্র ছবি এঁকেছিলেন। এক-আধখানা ছবি নয়, দেড় হাজার ছবি। অনায়াসেই কল্পনা করতে পারো যে, কেউ যদি একেবারে দেড় হাজার ছবি আঁকেন তাহলে তাঁর সব ছবি সমান হবার কথা নয়। রুবেন্‌স্‌-এর সব ছবি সমান নয়। এর মধ্যে যেগুলি ভালো সেগুলি এতো ভালো যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছবির সঙ্গে সেগুলির তুলনা করতে কারুরই দ্বিধা হয় না। আর যেগুলি খারাপ সেগুলি এমনই সাধারণ যে মনে হয় তাঁর ছাত্রদেরও আঁকা হতে পারতো।

কিন্তু, কথা হলো, শিল্পীকে বিচার করবো তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি দিয়ে, না নিকৃষ্ট কীর্তি দিয়ে? নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ কীর্তি দিয়ে। আর সে-বিচার অনুসারেই রুবেন্‌স্‌ হলেন অতো মহৎ শিল্পী।

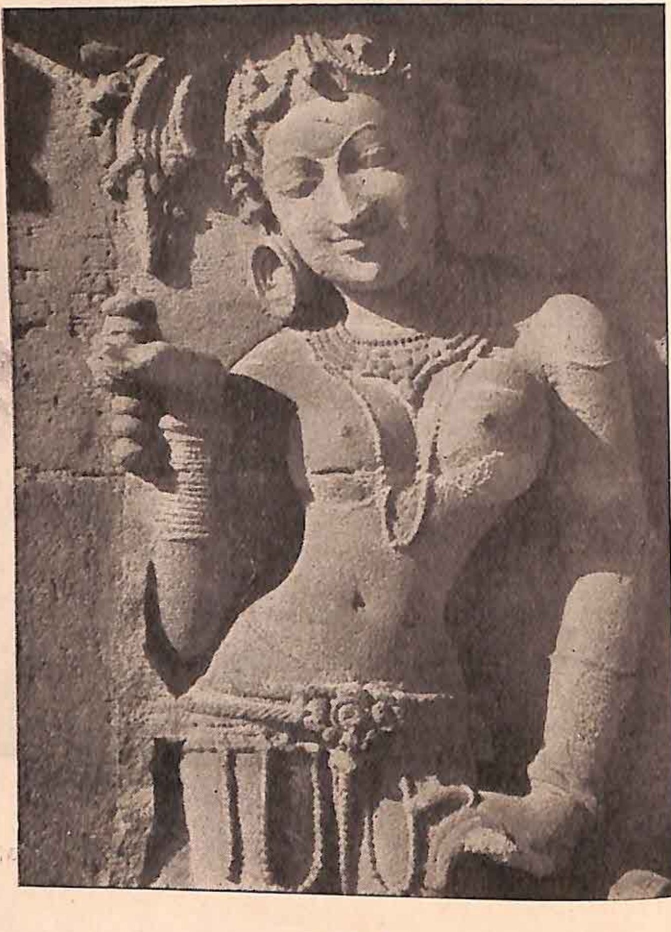
রুবেন্‌স্‌-এর ছাত্র ভ্যান-ডাইক-ও (Van Dyek : ১৫৯৯ ১৬৪১) ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত। তাঁর সবচেয়ে বেশি খ্যাতি হলো পোট্রেট্‌ বা portrait আঁকার জন্য। পোট্রেট মানে প্রতিকৃতি—অর্থাৎ অমুখের ছবি, ব্যক্তিবিশেষের ছবি, ব্যক্তিবিশেষ হিসেবেই আঁকা। অবশ্যই, একথা ঠিক যে লিঅনার্দোই বলো আর রাফেইলই বলো, ধর্মবিষয়ক ছবি আঁকবার সময় তাঁরাও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বাস্তব মানুষ থেকেই ছবি আঁকতেন। যেমন, রাফেইলের আলোচনায় দেখলাম, তিনি একটি চাষীর বৌকে দেখেই তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ম্যাডোনা বা মাতৃমূর্তি এঁকেছিলেন। কিন্তু তবুও এই ম্যাডোনাকে আমরা চাষীর বৌ-এর পোট্রেট বলবো না। কেন নয়? কেননা, চাষীর

ভারতীয় শিল্প : ৬৪ পৃষ্ঠার পর



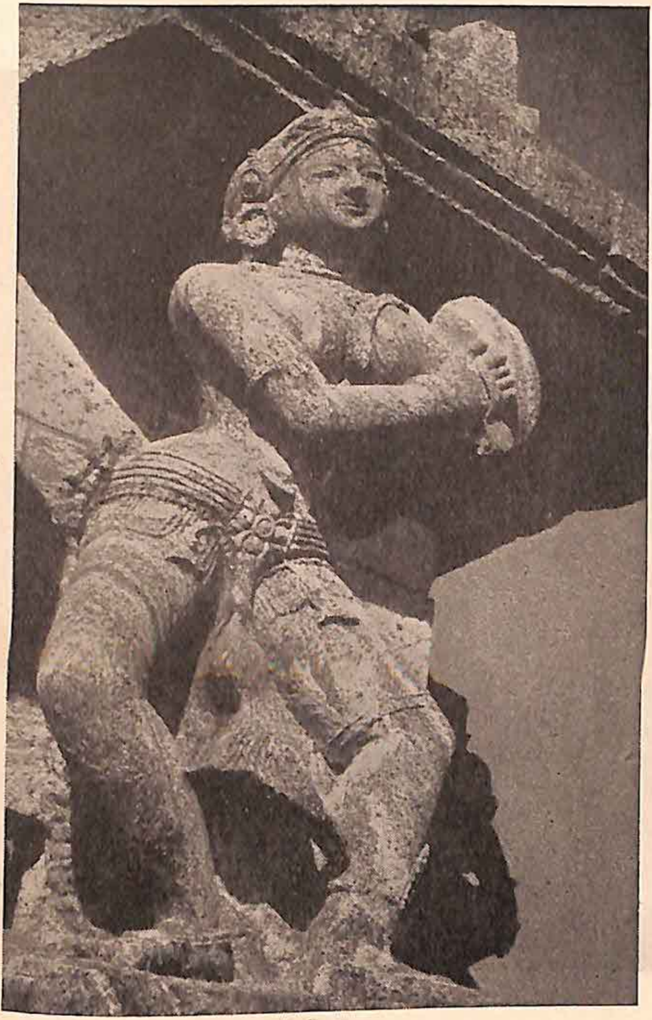
কোনারক

ফটো : সুনীল জানা



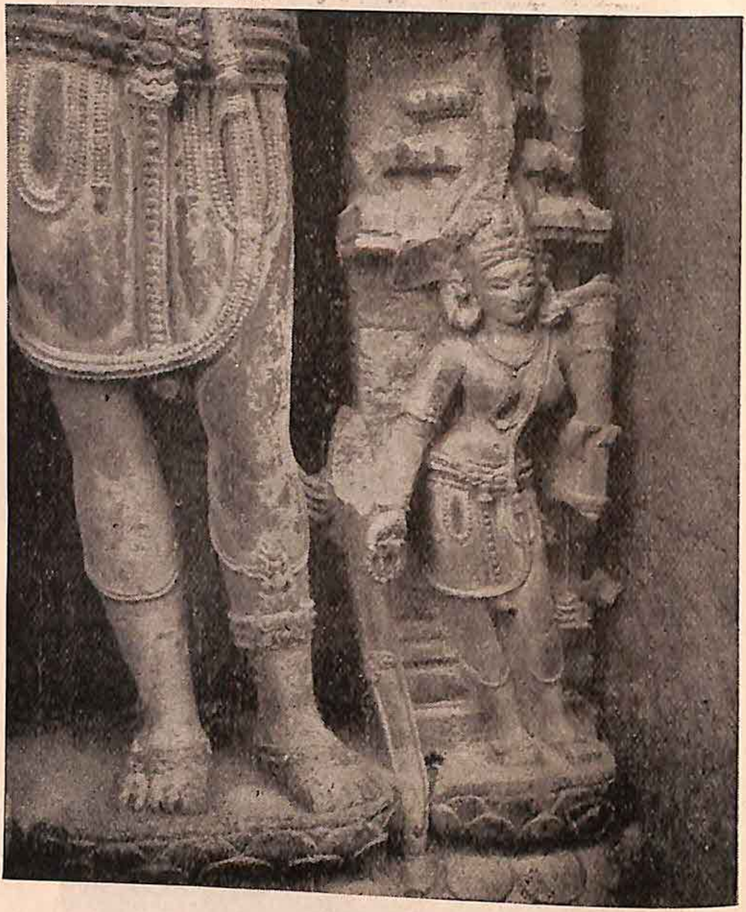
ভুবনেশ্বর

ফটো ঃ সুনীল জানা



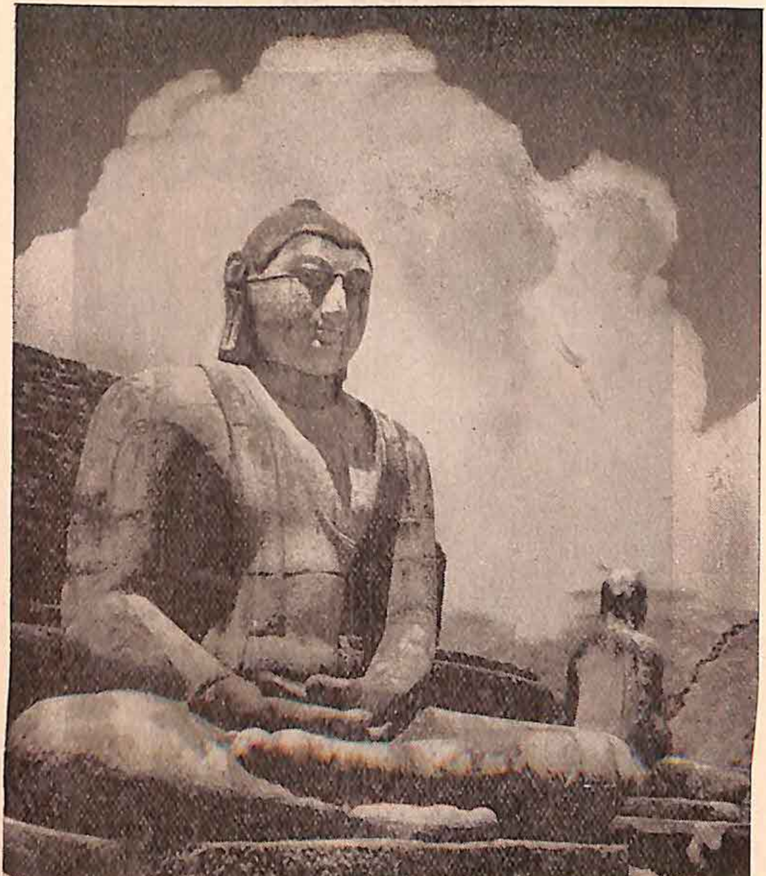
কোনারক

ফটো ঃ সুনীল জানা



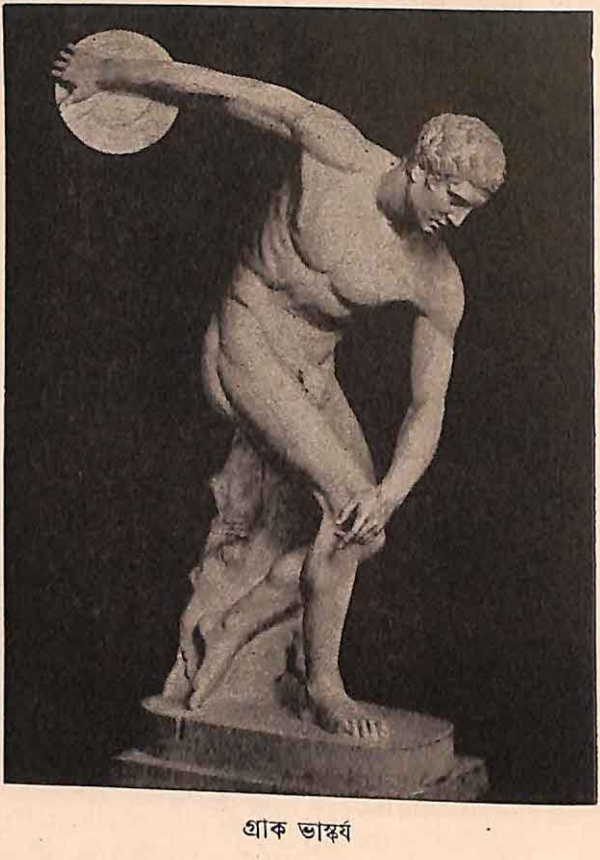
ভুবনেশ্বর

ফটো : সুনীল জানা



সিংহল

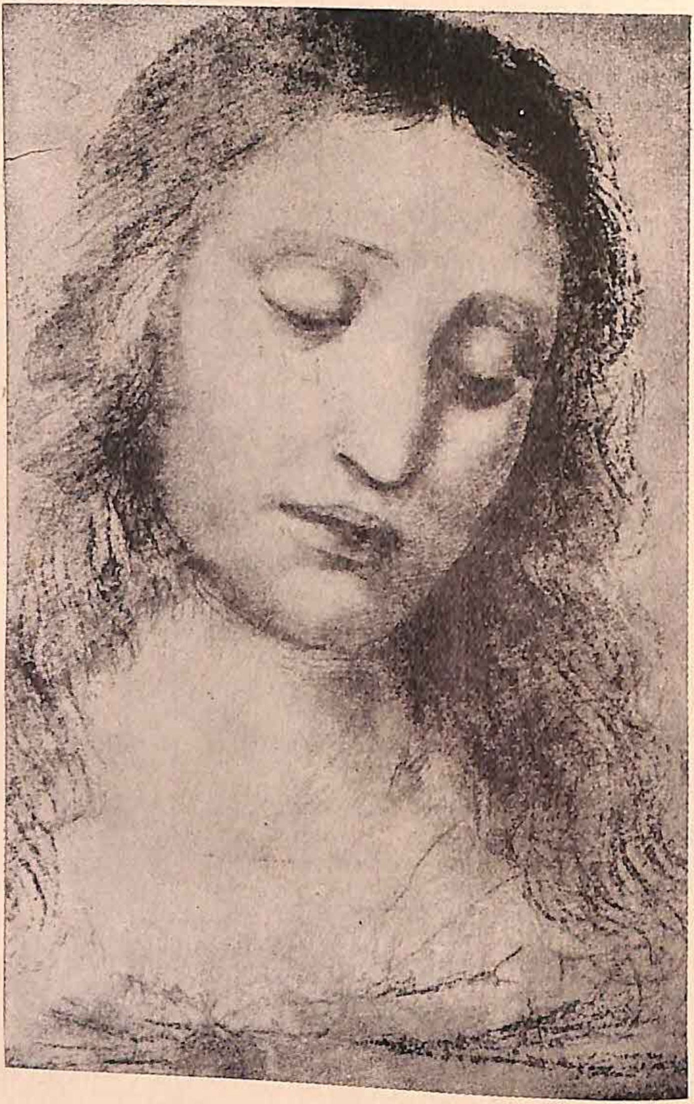
ফটো: সুনীল জানা



গ্রাক ভাস্কর্য



ফ্রা এঞ্জেলো



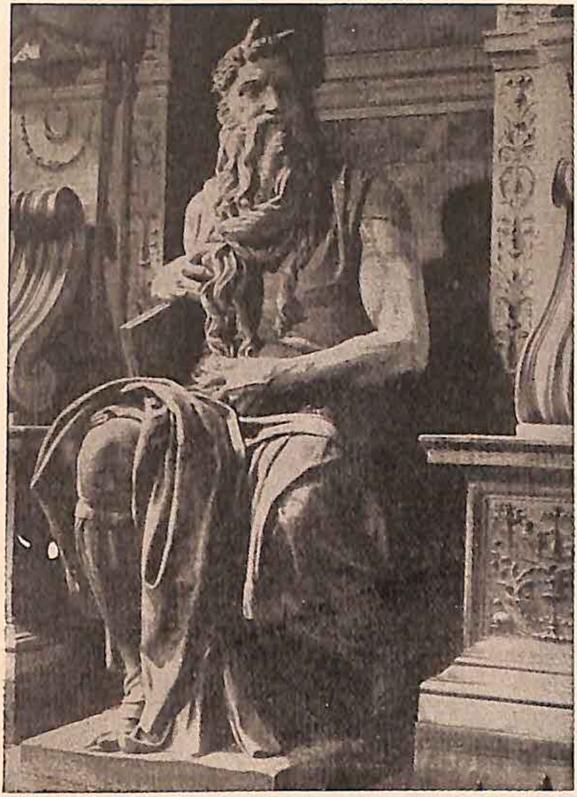
লেওনার্দো দা ভিঞ্চি



লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি



লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি : মোনা লিসা



মাইকেল এঞ্জেলো : ডেভিড
(ভাস্কর্য)



মাইকেল এঞ্জেলো



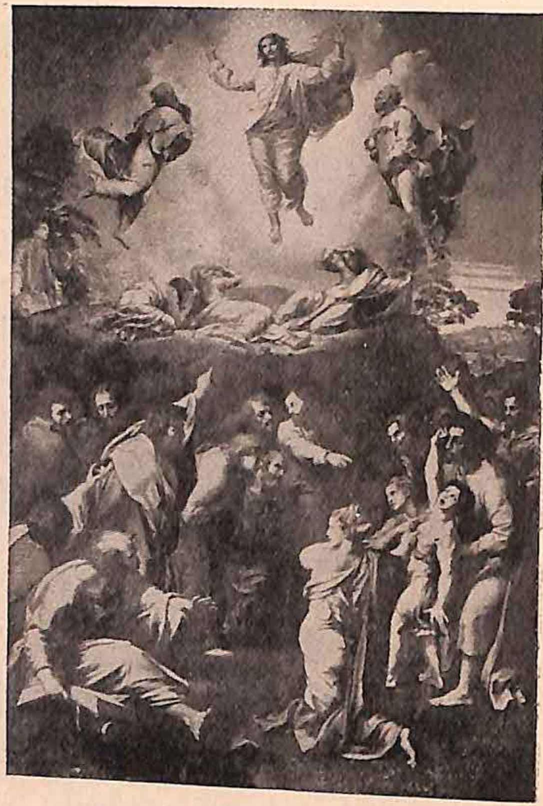
মাইকেল এঞ্জেলো



মাইকেল এঞ্জেলো



র‍্যাফেইল : সিস্‌টাইন ম্যাডোনা



র‍্যাফেইল



বতিচেল্লি



তিসান



রুবেন্‌স্



রেম্‌ব্রাণ্ট



ভ্যান্ ডাইক



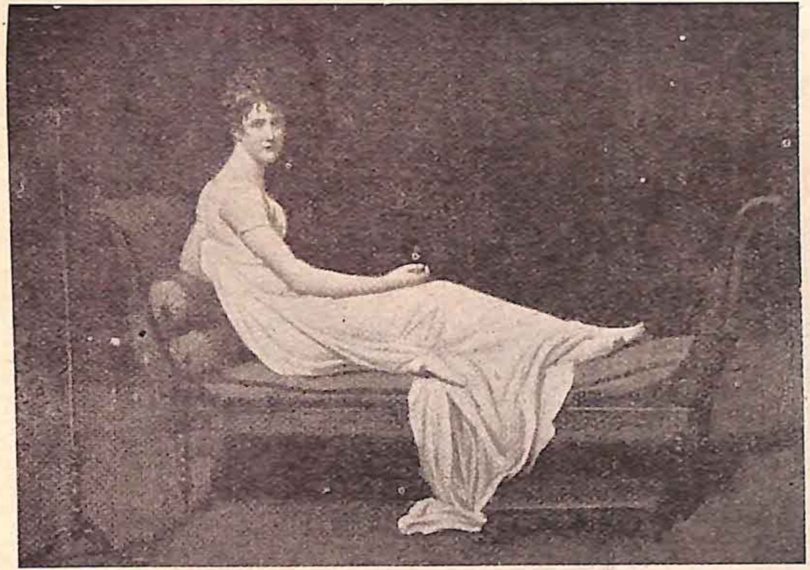
ভার্‌মীর



হল্‌স্‌

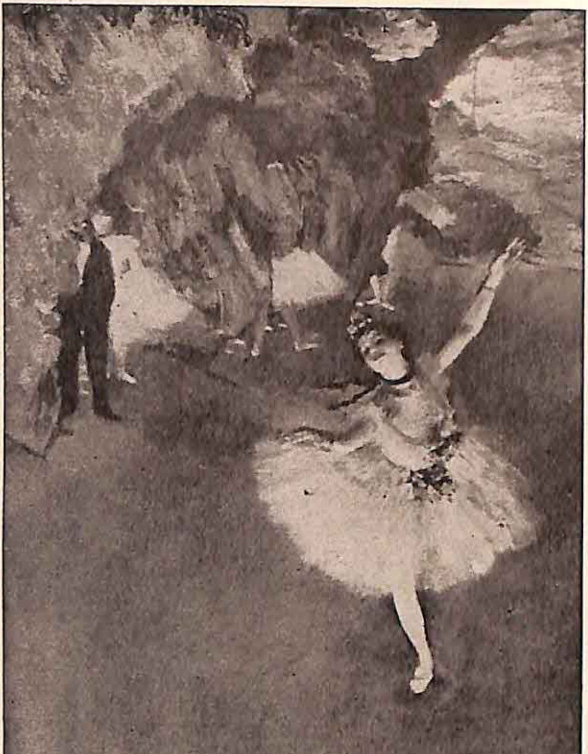


মূরীল্লো

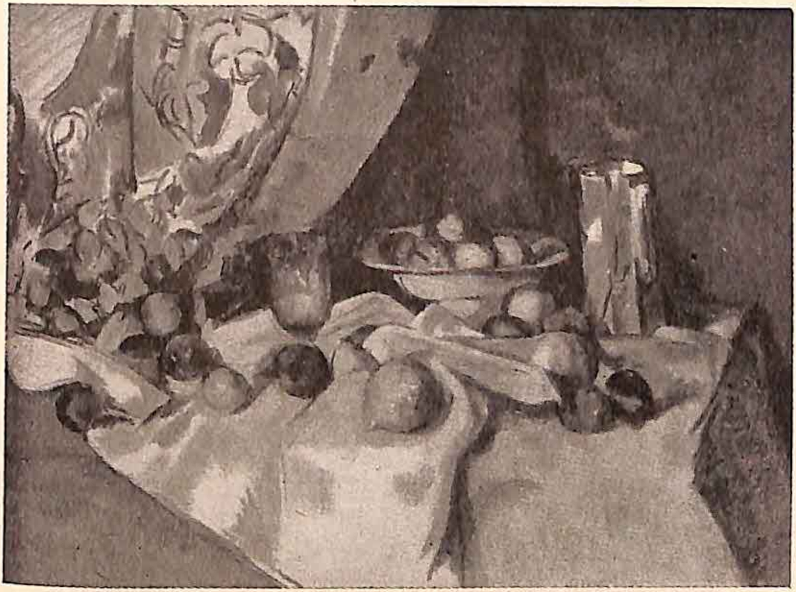


দাভিদ

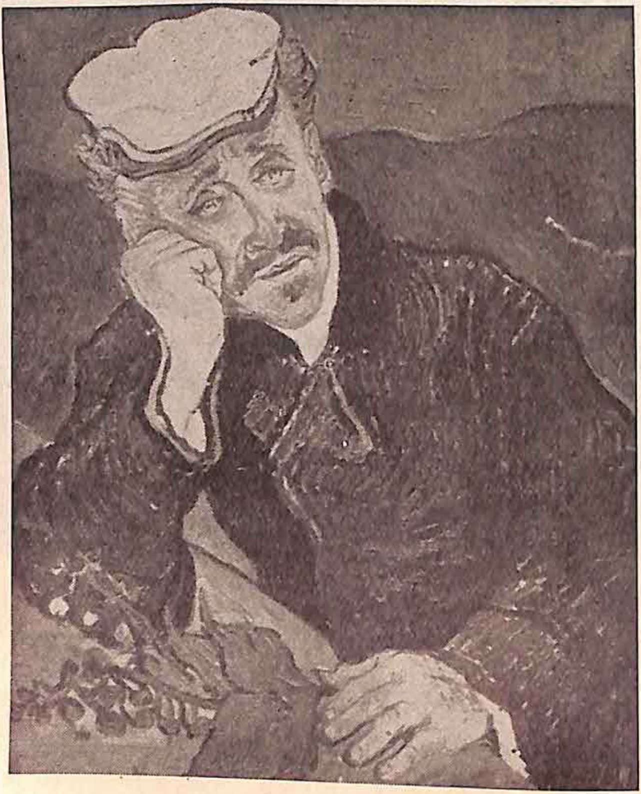
(এই জাতীয় শিল্পনীতির বিরুদ্ধেই ইম্প্রেশনিস্টদের বিদ্রোহ)



দেগা



সেজান



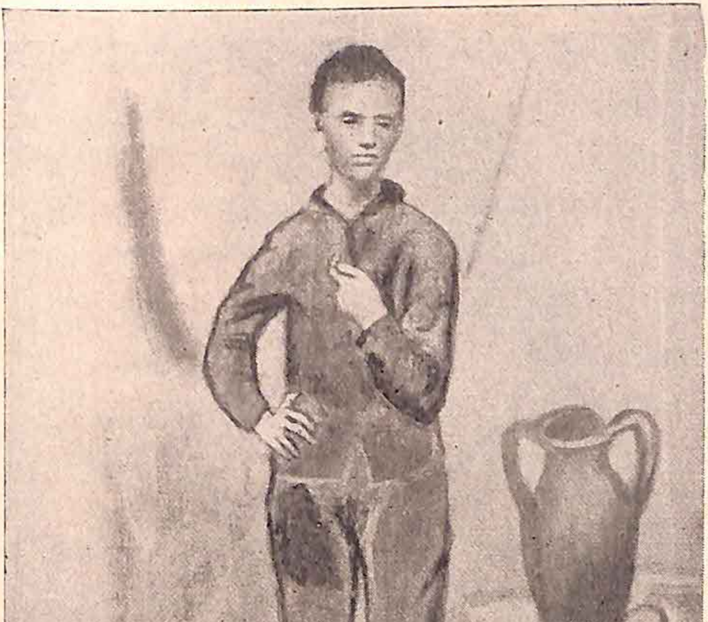
ভান্ গখ্



গোগ্যাঁ



মাতিস



পিকাসো



পিকাসো

বৌকে মডেল হিসেব গ্রহণ করলেও তাঁর ছবির আসল বিষয়বস্তু তো আর সেই মেয়েটির ছবিই নয়—তার বদলে যীশুখ্রীষ্টের মায়ের ছবি। চাষীর বৌএর পোট্রেট হলে তাকে আর যীশুখ্রীষ্টের মা বানাবার চেষ্টা করা হতো না ; তার বদলে শুধু সেই চাষীর বৌটি হিসেবেই আঁকা হতো।

রুবেন্স্ও অনেক পোট্রেট এঁকেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে ভ্যান ডাইকের নামডাক এতো বেশি যে তাঁর পোট্রেটগুলিকে সমঝদারেরা গুরুদেব রুবেন্স্-এর পোট্রেটের চেয়েও বেশি তারিফ করেন। কিন্তু সেটা বোধ হয় বাড়াবাড়ি। পরের যুগে একটা সময়ে ইংরেজ শিল্পীদের মধ্যেও পোট্রেট আঁকবার দিকে খুব ঝোঁক দেখা দেয়। তখন তাঁরা এই ব্যাপারে ফ্লেমিশ সম্প্রদায়ের পোট্রেটকেই, বিশেষ করে রুবেন্স্ ও ভ্যান ডাইকের পোট্রেট অনুসরণ করবার চেষ্টা করেন।

॥ রেমব্রাণ্ট ও ডাচ সম্প্রদায় ॥

হল্যাণ্ডের শিল্পীদের মধ্যে যাঁকে সত্যিই প্রথম বড়ো বলা হয় তাঁর নাম হলো হ্যাল্স (Franz Hals)। তিনি পোট্রেট আঁকতেন, এবং পোট্রেট ছাড়া আর কিছুই আঁকেননি। অবশ্য ডাচ সম্প্রদায়ের সবাইই পোট্রেট এঁকেছেন।

ডাচ-সম্প্রদায়ের ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, ইউরোপের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেলো শিল্পীরা একেবারে দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের সাধারণ

বিষয়গুলিকেই ছবির বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করতে লাগলেন। এর আগে তো ধর্মমূলক বিষয় ছাড়া আর কোনো কিছুর ছবি আঁকবার কথাই উঠতো না ; ফ্লেমিশ সম্প্রদায়ের কাজে দেখা যায়, শিল্প এই মরলোককেও স্বীকার করতে শুরু করেছে। সেই স্বীকৃতিই আরো স্পষ্ট, আরো নির্ভীক হয়ে উঠতে দেখা গেলো ডাচ-সম্প্রদায়ের ছবিতে। ডাচ শিল্পীরা শুধুই যে আভিজাতিক শ্রেণীর ঘরোয়া জীবন নিয়ে ছবি আঁকতে লাগলেন তাও নয় ; সাধারণ গৃহস্থ ও গরিবদের ঘরদোর নিয়েও। তাছাড়া, আর্টিস্ট-এর স্টুডিও, খাবারের টেবিলে কথাবার্তা হওয়া, একেবারে সাধারণ রাস্তাঘাটের ছেলেপুলে—নানাবিধ বিষয়।

মরলোকের দিকে এইভাবে শিল্পীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার ফলে ছবির কলাকৌশলেও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে লাগলো। শিল্পীরা অনেক নিখুঁত হবার দিকে মন দিলেন। তাছাড়া, আলো-ছায়ার প্রভাব ডাচ শিল্পে যে-ভাবে পড়েছে তা এর আগে ইউরোপের শিল্প-ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি। যার ছবি আঁকছি তার উপর কোন দিক থেকে কীভাবে আলো এসে পড়ছে এবং সেই আলোর দরুন তার চেহারায় কী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে—একথা ডাচ-সম্প্রদায়ের শিল্পীরা ছবির ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে খুবই যত্নবান্।

আলো-ছায়ার প্রভাব ফুটিয়ে তোলবার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে রেমব্রাণ্ট (Rembrandt) : ১৬০৬—১৬৬৯) নিশ্চয়ই একেবারে অদ্বিতীয়। বস্তুত, শুধু ডাচ-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন, পৃথিবীর

সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে তাঁকে একজন বলে স্বীকার করতেই হবে।

রেম্‌ব্রান্ট-এর ছবিতে আলো-ছায়ার কাজ যে সত্যিই কী অপরূপ তা লিখে বলা অসম্ভব, চোখে না দেখলে তা ঠিকমতো বোঝা যায় না। সমালোচকরা বলেন, মানবমনের গভীরতম রহস্য তিনি ওই আলো-ছায়ার সাহায্যেই ফুটিয়ে তুলতে পারতেন এবং ফুটিয়ে তুলতেন। আপাত-দৃষ্টিতে যে বিষয়বস্তুকে হয়তো অতি-সাধারণ ও তুচ্ছ মনে হচ্ছে তিনি তারই ছবি আঁকবার সময় আলো-ছায়ার এমনভাবে ব্যবহার করতেন যে ছবিটির মধ্যে অত্যন্ত গভীর ব্যঞ্জনা ফুটে উঠতো।

শিল্পী হিসেবে রেমব্রান্ট-এর মনের কৌতূহল ছিলো অসীম ও প্রায় সর্বব্যাপী—যে-কোনো ব্যাপারই হোক না কেন, তিনি তাকে শিল্পের বিষয়বস্তু করে নিতে দ্বিধা করতেন না। তাই, পৌরাণিক ছবি, ইটালিয়ান শিল্পীদের বিষয়বস্তু ইত্যাদি থেকে শুরু করে সাধারণ জীবনের দৃশ্যও তিনি এঁকেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে, শিল্পী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলো অত্যন্ত সবল। তাই কোনো-এক বিষয়বস্তুকে শিল্পে রূপ দেবার সময় তিনি যেন বিষয়বস্তুটির তর্জমা করে নিতেন নিজের শিল্পবোধের ভাষায়। তাঁর ছবিতে বাস্তবের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব বোধের, নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনার অপরূপ সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর আঁকা এমনকি পৌরাণিক ছবিও সাবেক কালের পৌরাণিক ছবির মতো নয়।

আর এইদিক থেকে বলা যায়, সাবেক কালের শেষ ও

আধুনিক কালের শুরু—এই দুয়ের মধ্যে যে-সীমারেখা তারই স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলো রেম্‌ব্রাণ্টের ছবিতে।

॥ ফরাসী ইম্‌প্রেশন্‌ইজম্‌ঃ বিদ্রোহী শিল্পীর দল ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসে এক প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হলো। একদল শিল্পী বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন শিল্পের ক্ষেত্রে চিরাচরিত ও বাঁধাধরা রীতিনীতির বিরুদ্ধে। প্রথমটায় সমালোচকের দল এঁদের সম্বন্ধে তীব্র বিদ্রূপ ও বিদ্বেষের বিষোদ্গার করেছিলেন ; সাধারণ দর্শকেরাও এঁদের সম্বন্ধে উপেক্ষারই ভাব দেখিয়েছিলেন—যেন একদল পাগল বা ছিটগ্রস্ত লোক ছবি আঁকার নামে পাগলামি শুরু করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁদের বিদ্রোহ সফল হলো। আধুনিক পৃথিবী তাঁদের স্বীকার করে নিলো এ-যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে।

প্রথমে বুঝতে হবে, এঁরা হঠাৎ সাবেকী রীতিনীতির বিরুদ্ধে অমনভাবে খেপে উঠলেন কেন? এই প্রশ্নের জবাব বুঝতে হলে সে-সময়কার ফ্রান্সের চিত্রজগতের পরিস্থিতিটি মনে রাখা দরকার।

ফরাসী দেশে তখন তরুণ শিল্পীদের পক্ষে সত্যিই একটা শ্বাসরোধ হবার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো। প্রধানত দাভিদ (David : ১৭৪৮—১৮২৫) বলে একজন শিল্পী এবং ডি-কুইন্‌সি (de Quincy) বলে একজন লেখক শিল্পের

রীতিনীতিকে বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, শিল্পীর পক্ষে কোনো রকম খেয়ালখুশি নিয়ে মেতে ওঠা চলবে না; প্রাচীন পৃথিবীতে শিল্পের বিকাশ যে-পথে হয়েছিলো সেই পথটাই হলো শিল্পের পক্ষে আদর্শ। তাই একালের শিল্পীও সেই নির্দিষ্ট পথে এগুতে বাধ্য, এতোটুকুও নড়চড় করা চলবে না। অবশ্য, গ্রীক যুগের চিত্রকলা বিলুপ্ত হয়েছে; কিন্তু মর্মর-মূর্তি রয়েছে। তাছাড়া, রোমান যুগেরও অনেক চিত্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছে; সেগুলি রয়েছে। ওই মর্মর-মূর্তিগুলি গড়বার সময় গ্রীক শিল্পীরা মানবদেহের সামঞ্জস্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সব নিয়মকানুন মানতেন সেগুলিই হলো শিল্পের আদর্শ নিয়মকানুন। যন্ত্রের মতো সেগুলিকে অনুকরণ করাই হলো আধুনিক চিত্রকরের একমাত্র কর্তব্য। অবশ্যই, আধুনিক চিত্রকর তো ছবি আঁকবেন; তার জন্যে রঙের ব্যবহার করতে হবে। মর্মর-মূর্তি থেকে রঙ-ব্যবহার সংক্রান্ত কোনো বাঁধাধরা নিয়মের হদিশ নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না। দাভিদ প্রমুখেরা তাই সাব্যস্ত করলেন, চিত্রের ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহারটা আসলে বড়ো কথা নয়।

বলাই বাহুল্য, গ্রীক-যুগে গ্রীক-শিল্পীরা স্বাভাবিকভাবে যে-শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন আধুনিক যুগে তারই কয়েকটি আইন-কানুনকে অস্বাভাবিকভাবে নকল করতে গেলে নেহাতই কৃত্রিম এক-ধরনের শিল্প ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করাই সম্ভব নয়। কিন্তু ফরাসী দেশের শিল্প-জগতে এই সময়টায় যেন আইন-পাশ হয়ে গেলো ওই কৃত্রিম চেষ্টা ছাড়া শিল্পীরা আর কিছু করতে পারবেন না। আইন মানে? আসলে, ফরাসীদেশের

অ্যাকাডেমি বা শিল্প-সংসদ এই মতবাদকেই ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিলো। তাই এ-মতবাদ অনুসারে কাজ না করলে অ্যাকাডেমি কোনো শিল্পীকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না— অ্যাকাডেমিতে টাঙানো হবে না তাঁর ছবি, সমালোচকরা স্বীকার করবে না তাঁকে শিল্পী বলে।

অথচ, তরুণ শিল্পীদের পক্ষে ওই রকম ছকে-বাঁধা কতকগুলো কৃত্রিম নিয়মের মধ্যে যন্ত্রের মতো নড়াচড়া করা অসম্ভব। তাই তাঁদের শ্বাস-রোধ হবার উপক্রম হলো।

এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে ইম্‌প্রেশনিস্ট-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব।

ইম্‌প্রেশনিস্ট নামটা এসেছে এ-সম্প্রদায়ের একজন নেতার একটি ছবিকে উপলক্ষ্য করে একজন সমালোচক বিদ্রূপভরে যে-শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তার থেকে।

নেতার নাম হলো মানে (Edouard Mane) ঃ ১৮৩২-১৮৮৩)। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে ছবির বাৎসরিক প্রদর্শনীর জন্যে তরুণ শিল্পীরা যতো ছবি দিয়েছিলেন তার প্রায় সবই কর্তৃপক্ষ অপছন্দ করেন ও বাতিল করে দেন। ফলে চিত্রকরদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। অতএব তৃতীয় নেপোলিয়ন বললেন, বাতিল-করা ছবিগুলি তিনি স্বয়ং দেখতে চান এবং বিচার করতে চান কর্তৃপক্ষ অন্যায় করেছেন কিনা। তৃতীয় নেপোলিয়ন ওই বাতিল-করা ছবির মাত্র খান-কয়েক নিজে দেখলেন। তাঁর মনে হলো, নির্বাচিত ছবির তুলনায় এগুলি এমন কিছু খারাপ নয়। তিনি তাই

হুকুম করলেন,—নির্বাচনের কাজে কর্তৃপক্ষ উচিত আচরণ করেন নি, অতএব বাতিল-করা সব ছবিই প্রদর্শনীতে দেওয়া হোক।

সে-বছর প্রদর্শনীর জন্যে মানেও একটি ছবি দিয়েছিলেন এবং তাঁর ছবিটি যথারীতি বাতিল হয়েছিলো। কিন্তু, নেপোলিয়নের ও-রকম হুকুমের ফলে বাতিল-হওয়া ছবির ভিড়ের মধ্যে মিশে মানের ছবিটিও সে-বছর প্রদর্শনীতে টাঙানো হলো। তৃতীয় নেপোলিয়নের চোখে আগে যদি এই ছবিটি পড়তো তাহলে তিনি তা প্রকাশ্যে টাঙাতে দিতেন কিনা সন্দেহ। ছবিটি টাঙানো হবার পর সবাই যখন হাঁউমাউ করতে লাগলো যে ওটা খুব খারাপ, খুব দুর্নীতিমূলক ছবি, তখন তৃতীয় নেপোলিয়নও নাকি তাঁর নিজের ঢালাও ফরমানের জন্যে আক্ষেপ করেছিলেন।

মানে তাঁর এই ছবিটির নাম দিয়েছিলেন, ইম্‌প্রেশন্‌স্। ওই নাম থেকেই জনৈক সমালোচক বিদ্রূপ সমালোচনা করবার সময় বললেন, এ-হলো ইম্‌প্রেশনিস্ট দলের নেতার ছবি। আর সেই থেকেই চালু হয়েছে ইম্‌প্রেশনিস্ট বলে নাম।

তার মানে এই নয় যে ইম্‌প্রেশনিস্ট-সম্প্রদায় বলতে কয়েকটি বাঁধাধরা রীতিনীতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো সম্প্রদায়। আসলে সে-সময়ের কয়েকজন প্রতিভাশালী তরুণ শিল্পী কর্তৃপক্ষের কৃত্রিম শাসনে পীড়িত হয়ে, প্রায় অবস্থার ফিকিরে পড়ে, প্রধানত কয়েকটি কাফে-তে মিলিত হতেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন,

তর্ক-বিতর্কও করতেন, এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান যেটা মিল তা হলো কর্তৃপক্ষের ওই জবরদস্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সে-সময়ের সমালোচকেরা, এমনকি সাধারণ দর্শকেরাও, এই শিল্পীদের সম্বন্ধে নানা রকম ঠাট্টা-তামাসা করতেন—যেন একদল বখাটে ছেলে মিলে ছবির নামে বখামি শুরু করেছে।

এরা ভাবতেন, ছবিতে কোনো রকম শাশ্বত সত্যকে ফুটিয়ে তোলবার প্রশ্ন ওঠে না। পরিবর্তনশীল জগৎ আমাদের মনের উপর প্রতি-মুহূর্তে নিত্যনবীন রেখাপাত করছে। এবং এই মুহূর্তের অভিজ্ঞতাটিকেই ফুটিয়ে তোলা হবে আমাদের কাজ। তাই বাস্তব বস্তুটা আসলে কী রকম, তা বর্ণনা করবার দায়িত্ব শিল্পীর নয়। শিল্পী বলবেন, এই মুহূর্তে ওই বাস্তব বস্তুটি আমার চোখের সামনে কীভাবে প্রতিভাত হচ্ছে; জিনিসটাকে আমি যেদিক থেকে দেখছি সেদিক থেকে দেখলে যদি বাঁকাচোরা দেখায় তাহলে আমি বাঁকাচোরা করেই তাকে আঁকবো, পারিপার্শ্বিকের জিনিসগুলি দিনের একটা বিশিষ্ট সময়ে বিশেষভাবে সূর্যের আলো পাবার ফলে যে-ভাবে বিশিষ্ট রঙ-ধারণ করে তাদের আঁকবার সময় সেই রকম বিশিষ্ট রঙ-ই ব্যবহার করবো।

এই সময়ে হেলম্‌হোস্‌ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা আলো সম্বন্ধে নতুন বৈজ্ঞানিক মত প্রচার করলেন: আলো হলো ঢেউয়ের মতো—সূর্যের আলোর মধ্যে সাত রকমের ঢেউ মিশে রয়েছে, সেই ঢেউই বস্তু থেকে ঠিকরে ফিরে এসে আমাদের চোখে রঙের খবর দেয়। ইম্‌প্রেশনিস্টরা এই বৈজ্ঞানিক মতবাদের

দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই ছবি আঁকবার সময় তাঁরা এ-রঙের সঙ্গে ও-রঙ মিশিয়ে মাঝারি রঙ তৈরি করতে চাইতেন না; ওই সাতটি রঙ-কে নির্ভেজাল ভাবে ব্যবহার করতে চাইতেন। এই কারণে তাঁদের ছবিতে চড়া-রঙের ছড়াছড়ি। তাই আলো আর রঙ তাঁদের ছবির একটি প্রধান কথা হয়ে উঠলো।

মানে, পিসারো (Camille Pissarro : ১৮৩০—১৯০৩) এবং দেগা (Edgar Degas : ১৮৩৪—১৯১৭) হলেন ইম্‌প্রেশনিস্টদের মধ্যে প্রধান। দেগার সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি হলো রেসের মাঠের ঘোড়া আর ব্যালে-নাচিয়ে মেয়েদের নিয়ে।

॥ ফরাসী শিল্পের নতুন ধারা ॥

ফরাসী দেশে ছবির ইতিহাসে মোড় ঘুরলো। এরপর নতুন ধারায় ছবি এঁকে আধুনিক যুগে যাঁরা অমর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আর কয়েকজনের কথা বলে আমরা ইউরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাস শেষ করবো।

এঁরা হলেন, সেজান, গোগ্যাঁ, ভান্ গখ্, মাতিস, পিকাসো।

অতি-আধুনিক কালে সেজান্-ই (Paul Cezanne : ১৮৩৯—১৯০৬) বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী। বাল্য বয়সে তাঁর প্রধান বন্ধু ছিলেন ফরাসী লেখক এমিল্ জোলা। কিন্তু ভারি খিটখিটে মেজাজ ছিলো সেজানের। কারুর সঙ্গেই কোনো রকম বন্ধুত্ব টিঁকতো না। শেষের দিকে

এমনকি জোলার সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয়ে যায়। শিল্পীদের মধ্যে অমন একা-মানুষ বোধ হয় আর কেউই ছিলেন না। শুরুর দিকে তিনি মানে, দেগা ইত্যাদির আড্ডায় যেতেন। কিন্তু পরে তিনি ইম্‌প্রেশনিস্টদের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। তিনি বললেন, বিজ্ঞান নিয়ে এরা বড়ো মাতামাতি করছে--আমার সঙ্গে বিজ্ঞানের আবার সম্পর্ক কী?

সেদিক থেকে সত্যিই ভারি অদ্ভুত ছিলো তাঁর চরিত্র।

ব্যবহারের দিক থেকে মনে হয় খিটখিটে বদ-মেজাজী লোক —কারুর সঙ্গেই যেন বনতে চায় না, কাউকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না, সইতে পারে না, এমন অস্বাভাবিক। অথচ, তাঁরই আঁকা ছবিগুলির মধ্যে একটা অপরূপ শান্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়—মনে হয় শিল্পী তন্ময় হয়ে রয়েছেন প্রকৃতির সৌন্দর্যের ধ্যানে। কোনো রকম সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, অসুন্দর বা কুৎসিতের ক্ষীণতম রেশও তিনি যেন ছবির মধ্যে স্বীকার করবেন না। তাই সাধারণ চোখে সাধারণ মানুষ পৃথিবীটাকে যে-ভাবে দেখে সেজানের দেখার সঙ্গে যেন তার মিল হয় না। সেদিক থেকে এমনকি এ-কথাও বলা হয় যে সেজানের মেজাজটা ছিলো গ্রীক শিল্পীদের চেয়েও চূড়ান্ত। গ্রীক শিল্পীরা, আগেই বলেছি, কোনো এক বিশেষ মানুষের মূর্তি গড়বার বদলে চেষ্টা করতেন আদর্শ মানুষের বা মানুষের আদর্শ রূপটির পরিচয় দিতে। সেজানের ছবিও যেন সেই রকম। হয়তো ফলের ছবি আঁকছেন, বা ফুলের ছবি আঁকছেন, কিংবা হয়তো আঁকছেন

কোনো প্রাকৃতির দৃশ্যের বা মানুষের ছবি—কিন্তু আঁকবার সময় এগুলির স্থূল দৈনন্দিন পরিচয়টাই সেজানের কাছে বড়ো কথা নয়। ছবির ওই ফলটা তো আর খাবার ফল নয়; তাই সেজানের পক্ষে ফলটার চেহারা এমনভাবে আঁকবার কথা ওঠে না যার সঙ্গে খাওয়ার ফলটির গোলমাল হয়ে যেতে পারে। তার বদলে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন ফলের সেই রূপটা যা দেখে আমাদের চোখ জুড়োবে, মিটবে সৌন্দর্যের পিপাসা। যাঁরা খাওয়ার ফল দেখতে চান তাঁরা ফলের দোকানে কিংবা বিজ্ঞাপনের ছবিতে ফল দেখুন গে যান। কিন্তু ফলের পিছনে যে-আদর্শ একটা রূপ আছে তা দেখবার মতো উৎসাহ থাকলে ফলের ছবি দেখবেন আসুন—এই যেন সেজানের বলবার কথা। তাই তাঁর ছবি বাস্তব ফলটিকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যায় নির্লিপ্ত রূপের জগতে একটা অপরূপ রূপকে খুঁজে পাবার জন্যে।

॥ গোগ্যাঁ আর ভান্ গখ্ ॥

এমন পাগল লোক নাকি শিল্পীদের মধ্যে আর কখনো জন্মায়ই নি। ভান্ গখ্ তো শেষকালে সত্যি সত্যি উন্মাদ পাগলই হয়ে গিয়েছিলেন। সে-গল্প শুনলে গায়ে যেন কাঁটা দেয়। তখন গোগ্যাঁ গিয়ে রয়েছেন ভান গখের ঘরে। রাতে একদিন পথে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো কে যেন পিছু পিছু আসছে, ফিরে দেখেন ভান্ গখ্—হাতে একটা খোলা ক্ষুর, চোখে উন্মাদের বিহ্বল দৃষ্টি। ভয়ে সেদিন রাতে গোগ্যাঁ আর সে-ঘরে ফিরতে

পারলেন না। পরে দেখা গেলো ভান্ গখ্ ক্ষুরটা দিয়ে নিজের একটা কান কেটে, একটা খামে পুরে, কাটা কানটা পাঠিয়ে দিয়েছেন একটি মেয়ের কাছে। অবশ্য তার পরেই তাঁকে পাগলা গারদে দেখতে পাওয়া গেলো। উন্মাদ পাগল হয়ে গিয়েছেন।

অথচ, গোগ্যাঁ (Paul Ganguin : ১৮৪৮—১৯০৩) আর ভান্ গখ্ (Vincent Van Gogh : ১৮৫৩-১৮৯০)—দুজনেই এ-যুগের মহান শিল্পী। আসলে, যে-সমাজে যে-পরিবেশে এঁরা জন্মেছিলেন তাকে স্বীকার করে নেওয়া বা সহ্য করা এঁদের দুজনের কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। গোগ্যাঁ তাই এ-সভ্যতার গ্লানি থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন—একেবারে সুদূর তাহিতি-দ্বীপে। সেখানের অসভ্য মানুষদের জীবনে দৈন্য যতোই থাকুক না কেন, তারা সরল, তারা সুন্দর, গোগ্যাঁর কাছে তারাই যেন সত্যি-কারের মানুষ। গোগ্যাঁ তাহিতি-দ্বীপে থেকে গেলেন, তাহিতির মেয়েদের ছবি আঁকতে লাগলেন—সে-সব ছবি সত্যিই অপরূপ। কিন্তু আসলে তো আর মানুষ সভ্যতার ছোঁয়াচ থেকে সত্যিই পালাতে পারে না। তাহিতি-দ্বীপেও বিদেশী বণিকেরা আস্তানা গেড়েছিলো, তারা ওই সরল মানুষগুলিকে নির্মমভাবে শোষণ করতো। স্বভাবতই গোগ্যাঁ রুখে দাঁড়ালেন। সাদা চামড়ার লোক হয়েও কালা-আদমিদের হয়ে সাদা-চামড়ার লোকদের বিরুদ্ধেই লিখতে শুরু করলেন। বিদেশী বণিকেরা বা তাতে খুশি হবে কেন? গোগ্যাঁর জীবন তারা দুর্বিষহ করে দিলো। পালিয়ে গিয়েও শান্তি পেলেন না গোগ্যাঁ। আর ভান গখ্? এ-যুগের এ-সমাজের গ্লানি তাঁর পক্ষে এমন অসহ্য হয়ে

দাঁড়িয়েছিলো যে তিনি আর কিছুতেই পেরে উঠলেন না। ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো তাঁর বুদ্ধি, তাঁর বিচার-শক্তি। যতোদিন পেরেছিলেন এই পৃথিবীর কথা ভুলে রূপ আর রঙের অনাবিল নির্লিপ্ত এক সৌন্দর্যজগতে লুকিয়ে থাকতে, পালিয়ে বেড়াতে,—ততোদিন তিনি সে-চেষ্টা করেছেন। তাঁর আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে সত্যিই যেন পৃথিবীকে ভুলে যাওয়া যায়। তবু তিনি পারলেন না, উন্মাদ পাগল হয়ে গেলেন।

কিন্তু, তুমি বলবে, পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট, কদর্যতা, গ্লানি—এ-সব তো আর আজকের নয়। তা সত্ত্বেও আগেকার কালের শিল্পীরা তো কই এমন অধৈর্য হয়ে যায় নি,—এমনভাবে পালিয়ে যেতে চায় নি, ভেঙে পড়ে নি। মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর উপরেও নির্যাতন তো বড়ো কম যায় নি। কিন্তু তবুও তাঁর ব্যবহার তো এ-রকম অধৈর্যের মতো ছিলো না!

কিন্তু একটা মস্ত তফাত রয়েছে। এই তফাতটার কথা ভুলে যাওয়া চলবে না। সে-যুগের মানুষদের মনে এক-রকম বিশ্বাসের জোর ছিলো—ভগবানে বিশ্বাস, যীশু-খ্রীষ্টে বিশ্বাস, মেরি-মাতায় বিশ্বাস। সে-বিশ্বাস তাঁদের বাঁচিয়ে রাখতো। কিন্তু এ-যুগের এই ফরাসী-শিল্পীদের মন থেকে সে-বিশ্বাস ধুয়ে গিয়েছে, মুছে গিয়েছে। আর তাই সভ্যতার গ্লানি তাঁদের জীবনকে এমন নির্মমভাবে পীড়িত করেছে!

তাহলে কি শিল্পী আবার ওই বিশ্বাসকেই ফিরে পাবার জন্যে চেষ্টা করবেন নাকি? নিশ্চয়ই নয়। মরা-বিশ্বাসকে জাগিয়ে

তোলার শব-সাধনায় শিল্পের মুক্তি কী করে হবে?

তাহলে?

॥ পাব্লো পিকাসো ॥

পিকাসো (Pablo Picasso : জন্ম, ১৮৮১) নিশ্চয়ই আজকের দিনে জীবিত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

তিনি একের পর এক নানান পদ্ধতিতে ছবি এঁকেছেন। তাই সমালোচকেরা বলেন, তাঁর শিল্পীজীবনে নানান পিরিয়ড্ আছে।

একটা সময়ে তিনি নীল আর গোলাপি রঙ ব্যবহার করে আঁকতেন। এগুলিকে বলা হয় নীলের পিরিয়ড্ আর গোলাপির পিরিয়ড্। কিসের ছবি? সমাজের সবার নিচে, সবার পিছনে, ক্ষুধার্ত আর নোংরা আর হতভাগ্য মানুষদের ছবি। অন্নহীন, বস্ত্রহীন ভিখিরিদের ছবি। তাঁর ছবিতে এমন ব্যথা, এমন মমতা ফুটে উঠেছে ওই মানুষদের জন্যে যে ছবি দেখতে দেখতে তোমার বুক টনটন করবে। অথচ দয়া জাগাবার ছবি নয়। ঘৃণা জাগাবার ছবি। ওই দারিদ্র্য, ওই কদর্যতা, ওই অভাব, অনটন, অনাহার—এগুলি যে কী বীভৎস, কী কুৎসিত, কী রকম ঘৃণ্য, সেই কথাই।

আর এইখানেই হলো গোগ্যাঁ আর ভান্ গখের সঙ্গে পিকাসোর আসল তফাত। তিনি হলেন অনেক বেশি সচেতন। অনেক স্পষ্ট আর তীক্ষ্ণ তাঁর বিচার।

তিনি আজ বলতে চান, সভ্যতাকে ফেলে কোথায় পালাবে তুমি? তোমার সমস্যাটা তো আর পালাবার পথ খোঁজার সমস্যা নয়। তার বদলে তোমাকে খুঁজে পেতে হবে সমাধান। শিল্পী যখন দেখছেন, আজকের সভ্যতা অসুস্থ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে তখন তিনি কী করবেন? শিল্পীর ভাষায়, শিল্পীর চোখ দিয়ে, সেই অসুস্থতার কারণ নির্ণয় করবেন ; সেই অসুস্থতার নিরাময়ের পথ খুঁজবেন। এক কথায়, সমাজকে বদলাবেন। গড়ে তুলতে চাইবেন নতুন সুস্থ সমাজ।

পাব্‌লো পিকাসো তাই ছবির ভাষায় পালাবার উপদেশ দেন না। পালাতে চান না। তিনি হলেন বিপ্লবী। এ-সমাজ বদলে নতুন সমাজ রচনার কাজ করছেন তিনি। সে-কাজ নানা রকমের। সবাইকার উপর তার দায়িত্ব একই রকমের নয়।

পিকাসো মনে করেন, শিল্পীর উপর যে-বিশেষ দায়িত্ব, তিনি তাই সম্পাদন করতে চাইছেন।



১০ খণ্ডের তালিকা

এক ॥ বিজ্ঞান
দুই ॥ ইতিহাস
তিন ॥ ইতিহাস
চার ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
পাঁচ ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
ছয় ॥ পৃথিবীর খবর
সাত ॥ অর্থনীতি-রাজনীতি
আট ॥ সাহিত্য
নয় ॥ চারুশিল্প
দশ ॥ দর্শন

জানবার কথা শিখতে তো ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। তাহলে আবার 'জানবার কথা' কেন?

একটা সাদামাটা জবাব আছে।

ইস্কুলের বই ছাড়াও ছেলেমেয়েরা আরো কিছু কিছু বই পড়তে চায়। পড়েও। ইস্কুলেও পড়ে, ইস্কুলের বাইরেও পড়ে।

আমরা ইস্কুলের আঙিনার বাইরেই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসর জমাতে চেয়েছি। এ-আসরে বোঝা না-বোঝার সঙ্গে পাস-ফেলের সম্পর্ক নেই। ওরা তাই সহজ হয়ে শুনছে, আমরাও সহজ করে বলছি।

বিদেশী বুক অফ নলেজ ধরনের বই-গুলির মতো 'জানবার কথা' প্রধানতই পাতা উলটে ছবি দেখবার বই নয়। ছবির বই আর পড়বার বই— দুইই। এতো হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ যে-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পেয়েছে তারই সারাংশ সহজ করে বলা হয়েছে 'জানবার কথা'য়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত